গান্ধীজী কি চান

নির্মলকুমার বসু

সর্ব সেবা সংঘ প্রকাশন

গান্ধীজী কি চান

নির্মলকুমার বসু

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি

সি-৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক ঃ
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি-৫২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিতাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬

* *

সর্ব সেবা সংঘ প্রকাশন
নভেম্বর ১৯৫৮
২২০০

মূল্য
পঁচাত্তর নয়া পয়সা

মুদ্রক ঃ
অজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

प्रकाशक
भवानीप्रसाद चट्टोपाध्याय
सर्वोदय प्रकाशन समिति
सि-५२, कालेज स्ट्रीट मार्केट
कलकत्ता-१२

पहला प्रकाश १९४६

* *

सर्व सेवा संघ प्रकाशन
नवम्बर १९५८
२२००

मूल्य
पचहत्तर नये पैसे

मुद्रक
अजितकुमार बसु
शक्ति प्रेस
२७-३-बि, हरि घोष स्ट्रीट
कलकत्ता-६

गान्धीजी कि चान

निर्मलकुमार बसु

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

লেখাগুলি প্রবন্ধ-আকারে শনিবারের চিঠিতে ধারাবাহিকরূপে বাহির হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া বন্ধুবর শ্রীসজনীকান্ত দাস কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথম সংস্করণের একটি অধ্যায় মাত্র বর্তমান সংস্করণে পরিবর্তিত করা হইল: "গান্ধীবাদ সম্বন্ধে আলোচনার" স্থলে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত অপর একটি লেখা "গান্ধীবাদ সম্বন্ধে তর্ক" নামে সন্নিবেশিত হইল। অবশিষ্ট গ্রন্থ পূর্ববৎ রহিয়াছে।

সম্প্রতি গান্ধীজীর মতবাদ সম্বন্ধে দেশে কিছু জিজ্ঞাসা ও চিন্তার উদয় হইয়াছে। ইহাকে সুলক্ষণ বলিতে হইবে। কলিকাতায় অবস্থিত সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি বর্তমান সংস্করণের প্রকাশভার গ্রহণ করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইতি

৩৭এ বসু পাড়া লেন,
কলিকাতা-৩
২ অক্টোবর, ১৯৫৮

নির্মলকুমার বসু

গড়ার কাজ এবং তাহা রক্ষা করার কাজ

একটি রূপক

এক বাড়িতে ভাই আর বোন থাকিত। বোন বড়, ভাই ছোট। ছোট হইলেও ভাইয়ের দুরন্তপনার সীমা ছিল না। রাতদিনই সে বাগানে বাগানে ঘুরিয়া কোথায় পাখীর বাসা, কোন্ গাছে ফল পাকিয়াছে, তাহারই সন্ধানে সময় কাটাইত। দিদির ছিল বাগানের শখ। সে খেলার সাথীদের বাড়ি হইতে ফুল তুলিয়া আনিত, গাছের চারা সংগ্রহ করিয়া সেগুলিতে সযত্নে জল দিত। আবার ফুল ধরিলে ভাইবোনে মিলিয়া সরস্বতীপূজার সময়ে সেই ফুলে অঞ্জলি দিত।

এমনই ভাবে দুইজনে বড় হইতে লাগিল। একদিন ভাইয়েরও দিদির মত বাগান করিবার শখ হইল। বাহিরে বৈঠকখানার পাশে পাঁচিলের ধারে কতকগুলি আগাছা জন্মিয়াছিল। সে কোদাল দিয়া চাঁচিয়া জায়গাটি পরিষ্কার করিল, কোথা হইতে বুনো ফুলের একটি গাছ আনিল এবং পাছে ছাগলে খায় এই ভয়ে এক বৃহৎ বাঁশের বেড়া বাঁধিতে বসিল। দিদির বাগানে কিন্তু বেড়া নাই। সে সর্বদাই ঘরে থাকে, সতর্কভাবে বাগানে পাহারা দেয়। দিদি ভাইকে ডাকিয়া বলে, অত উঁচু বেড়া বাঁধিওনা, লোকে যে তোমার ফুলগাছই দেখিতে পাইবে না। তারপর জিজ্ঞাসা করে, ভাই, তোমার কিসের গাছ? ভাই বলিতে পারে না, সে অতশত জানেও না। শেষে দিদি বৈঠকখানার ধারে

গিয়া দেখে, ভাই ধুতুরাফুলের গাছ লাগাইয়াছে। তখন সে হাসিয়া বলে, এরই জন্য এত বড় বেড়ার ঘটা।

আমাদের দেশে আগে সমাজের মধ্যে মানুষের ভাতকাপড়ের যে বন্দোবস্ত ছিল, তাহা বজায় রাখিবার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি এবং যত্নের প্রয়োজন হইত। কিন্তু পরাধীন হওয়ার পর বহুদিনের অযত্নে অবহেলায় সেখানে ধনতন্ত্রের রসে পুষ্ট নানাবিধ আগাছার উদ্ভব হইয়াছে। কচুরিপানা যেমনভাবে ক্রমে ক্রমে দেশের পুকুর খাল বিল ছাইয়া ফেলে, এই আগাছাগুলিও তেমনই বাড়িয়া গ্রাম্যজীবনের সহজ স্রোতের কণ্ঠরোধ করিয়া বসিয়াছে। যে সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া লোকে আগে ঘরকন্না করিত, আজ সেই কাজে দুমুঠা অন্নও জোটে না। আগাছার মত যে সকল নূতন বৃত্তি পুরাতনের স্থান দখল করিয়াছে, সেগুলির পরিবর্তে আবার নূতন নূতন বৃত্তির পত্তন করিতে হইবে। ধুতুরার মত শুধু বাহারে ফুলের শোভায় মজিয়া থাকিলে চলিবে না। যে চাষ করিলে মানুষের জীবন আবার স্বাস্থ্যে সম্পদে স্বাধীনতায় পুষ্টিলাভ করে, তাহার সন্ধান করিতে হইবে এবং সদাজাগ্রত দৃষ্টি লইয়া নূতন জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

আগাছার পরিচয়

বীরভূম জেলা ধানের দেশ। লোকে পূর্বকালে এদেশে ধান ছাড়া তুলা সরিষা আখ এবং প্রয়োজনমত রেড়ি শণ প্রভৃতি বুনিত। গৃহস্থের চেষ্টা ছিল যেন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য গাঁ ছাড়িয়া দূরে কোথাও যাইতে না হয়। গাঁয়ের মধ্যে কামার

কুমার ছুতার ধোপা নাপিত মালীর বাস ছিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রতি বৎসর গৃহস্থের কাছে ধানের একটি বাঁধা অংশ পাইত। কাহারও বা চাকরান জমির বরাদ্দ ছিল। যে জিনিস এক গ্রামে করা সম্ভব নয়, অথবা সর্বদা খরিদ করার প্রয়োজনও হয় না, তাহা গৃহস্থেরা শীতকালে ধান কাটার পর বিভিন্ন মেলায় গিয়া খরিদ করিয়া আনিত। কোন মেলায় প্রধানত গরুবাছুর বিক্রয় হইত, কোথাও বা লাঙল ঘরের দুয়ার জানালা, কোথাও বা পাটের কাপড় অথবা বাসনের খ্যাতি ছিল। কখনও কখনও আবার গৃহস্থ কাশী বৃন্দাবন অথবা শ্রীক্ষেত্রের মত সুদূর তীর্থে গিয়া সেখানকার বাসন, পট প্রভৃতি শখের জিনিষ খরিদ করিয়া আনিত এবং সেগুলি পুরুষানুক্রমে ছেলেপুলেরা ব্যবহার করিত।

দেশের মধ্যে চাষেরও তখন সুব্যবস্থা ছিল। গ্রামের মধ্যে অনেকে তাঁত বা অন্যবিধ শিল্প লইয়া থাকিত, চাষী আপন মনে চাষের কাজ করিত। তখন অজয় নদে বান আসিলে ঘোলা জলে মাঠঘাট ভরিয়া যাইত, কানা নদী এবং ছোটখাট কাঁদরগুলির পথে সেই জল সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িত। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ধোয়া পলিমাটির সংযোগে মাঠের শক্তি দ্বিগুণ বর্ধিত হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে পুকুরগুলিও সেই জলে ধুইয়া আবার মাছের পোনায় ভরিয়া উঠিত। একটু গুছাইয়া বানের জলকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে গৃহস্থের গোলা ধানে ভরিয়া উঠিত, পুকুরে যথেষ্ট মাছ হইত এবং গৃহস্থের প্রসাদে গ্রামের শিল্পীকুলেরও দেহ এবং মন স্বাস্থ্য ও আনন্দে পূর্ণ থাকিত।

কিন্তু কালক্রমে যেন এই ব্যবস্থার উপরে শনির দৃষ্টি লাগিল। পূর্বে এ দেশের ব্যবসাবাণিজ্য বেশির ভাগই অজয় নদীর পথে নৌকায় চলাচল করিত, আজকালকার মত গরুর গাড়ির চলন তখন ছিল না। অজয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে তাঁতী বা গালার কারিগরদের বাস ছিল। তাহাদের সুন্দর কাজ বিলাতে চালান দিয়া ওলন্দাজ অথবা ইংরেজ ব্যাপারীরা বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেশে রাজশক্তি ইংরেজ কোম্পানির হাতে যাওয়ার ফলে পূর্বতন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। এখানে তৈয়ারী শিল্পদ্রব্য বেচিয়া যে সামান্য লাভ হইত শক্তিশালী বণিকদের আর তাহাতে মন ভরিল না। সমগ্র উত্তর-ভারতে বিলাতী মালের কাটতি বাড়াইবার জন্য সরকার তখন হাবড়া, হুগলী, বর্ধমান এবং বীরভূমের চাষীর সুখ সুবিধার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া রেলের লাইন পাতিবার ব্যবস্থা করিলেন। রেলপথে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন গ্রাম হইতে ইষ্টিসান পর্য্যন্ত পাকা সড়ক বাঁধিয়া দেওয়া হইল। ধানের দর চড়িল, গাঁয়ের লোকে নগদ পয়সার প্রয়োজনে গরুর গাড়ি বোঝাই করিয়া সেই মাল শহরবাজারে বেচিয়া বেশ দুপয়সা কামাইতে লাগিল।

ধান বেচিয়া যে পয়সা লাভ হইত, গৃহস্থেরা এবার তাহার সাহায্যে কলের কাপড় কলের চিনি এবং কলের সরিষার তেল খরিদ করিতে লাগিল। মাটি অথবা পিতল কাঁসার পরিবর্তে এনামেল করা অথবা এলুমিনিয়মের বাসন ধরিল এবং তাহাদের পায়ে গাঁয়ে তৈয়ারি মোটা চটিজুতার পরিবর্তে চামড়া অথবা

ক্যাম্বিসের জুতা স্থান পাইল। ফলে গাঁয়ের গৃহস্থের আপাতত বাবুয়ানার কিছু সুবিধা ঘটিলেও তাহার পাশের ঘরে কলু তাঁতী কাঁসারী স্যাকরা বা মুচীর বৃত্তিনাশ হওয়ার ফলে সর্বসাকুল্যে গ্রামের মধ্যে দারিদ্র্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল।

সরকার আমদানি-রপ্তানির সুবিধার জন্য অজয় নদীর উপরে যে পুল বাঁধিয়াছিলেন, তাহার তাড়নায় আজকাল বান আসিলে তাহা যেন আর বাগ মানিতে চায় না। বানের জল মাঠের পর মাঠে হানা দিয়া বালিতে বোঝাই করিয়া দেয়, আবার কোনদিকে বা জল আদৌ পৌঁছায় না। কানা নদী ও কাঁদরগুলি কচুরি-পানায় ভরিয়া ওঠে। মাঠের মধ্যে ছেঁচের পুকুরগুলিও মজিয়া পচা ডোবায়, নয়ত শেষে চাষের ভূমিতে পরিণত হয়। ছেঁচের অভাবে রবিখন্দের চাষ কমিয়া আসিল, চাষা একান্তভাবে একটি ফসল বিক্রির মুনাফার উপরে নির্ভর করিতে লাগিল। এদিকে তাঁতী মুচী প্রভৃতি শিল্পীকুলের কাজ যাইতে বসিল। কেহ দিনমজুরি ধরিল কেহ গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল, অনেকেই চাষের দিকে ভিড় করিতে লাগিল। গোচারণের ভূমি, জ্বালানি কাঠের জঙ্গল সব কাটিয়া ধানের ক্ষেত হইল। গরুর খাদ্যাভাব ঘটিতে লাগিল। লোকে কাঠের অভাবে গোবর পোড়াইতে আরম্ভ করিল। আনাড়ী চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সারের একান্ত অভাবের ফলে জমির ফলনও ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতে লাগিল।

এদিকে মানুষের অভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যেও নানা অনাচার দেখা দিল। চুরিডাকাতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। হাড়ী ডোম বাগদী বাউরী ছুলে প্রভৃতি জাতির মধ্যে যাহারা শরীর একটু ভাল রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহাদের ভিতর কিছু লোক লাঠিয়াল হইয়া দাঁড়াইল। বামুন-কায়েতেও আগে ভালরকম লাঠি ধরিতে পারিত। নানা কারণে তাহাদের সমবেত শক্তি ক্ষয় হওয়ার ফলে তাহারা ছলে অথবা কৌশলে নিম্নশ্রেণীর বলিষ্ঠ লোককে অধীনে রাখিবার ফন্দী খুঁজিতে লাগিল, গরিব অথচ বলিষ্ঠ নিম্নশ্রেণীর প্রজাকে দশ ধারার মামলায় ফেলিয়া বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। এবং এই কাজে উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত বা ধনীশ্রেণীর লোক সরকার বাহাদুরের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে লাগিল। ফলে গ্রামের অধিবাসীগণের মধ্যে পূর্বে অন্নের ও তৎসহ সহযোগিতা ও প্রেমের যে বন্ধন ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়া সমস্ত সমাজকে শিথিল করিয়া দিল, বাঙালীর জীবনও ক্রমে শক্তিহীন হইয়া পড়িল।

কিন্তু ইহার ফলে কাহারও কি কোথাও সুবিধা ঘটে নাই? ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহা শুধু ধনী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের। তাঁহারা ধানচালের কারবারে নানা দিক হইতে বেশ দুপয়সা কামাইতে লাগিলেন। ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি ক্রমে ছোটখাট শহরে পরিণত হইল। গাঁয়ের মধ্যে যুগী তাঁতী এবং হাড়ী মুচীদের ঘরের সুন্দরী মেয়ে দারিদ্র্যের চাপ আর সহ্য করিতে না পারিয়া শহরের পল্লীতে ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিল। ম্যালেরিয়া বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ে যে দুচার ঘর ভদ্রলোক তখনও টিকিয়া ছিলেন, তাঁহারা ছেলেমেয়ের লেখাপড়া উপলক্ষ্যে অথবা রোগে চিকিৎসা এবং পথ্যের সুবিধা হইবে ভাবিয়া গ্রাম

ছাড়িয়া শহরে বাসা বাঁধিলেন। তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া শহরে ইস্কুল বসিল, হরিসভার পত্তন হইল, শিক্ষক ডাক্তার মোক্তার লেখক বা নাট্যকারগণের কারবার দিনের পর দিন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতে লাগিল।

যাঁহারা শুধু শহরটুকু দেখিলেন তাঁহারা খুশি হইলেন বটে, কিন্তু যাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে মরা গ্রামগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তাঁহারা বুঝিলেন, নূতন অর্থ নৈতিক বিপ্লবের ফলে গ্রামগুলিকে সংহার করিয়া শহরের শ্রীবৃদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে। কিন্তু এ শ্রী সম্পদের শ্রী নয়, কল্যাণের লক্ষ্মী নয়। লক্ষ্মীর সত্যকারের আসন ধানের গোলায়, কারিগরের কর্মশালায়। তাহার পরিবর্তে টাকার হাঁড়ির উপরে লক্ষ্মীর আসন রচনা করিতে গিয়া মানুষ স্বাস্থ্য হারাইতেছে, সম্পদ হারাইতেছে, এবং সকলের চেয়ে বড় কথা, নিজের ও সমাজের জীবনের উপরে সমস্ত কর্তৃত্ব হারাইতে বসিয়াছে। শুধু লোভের বশে, পরিশ্রম বিমুখতার ফলে নিজের কল্যাণের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সর্বনাশ সাধন করিতেছে।

নুতন জীবনের চারা ও তাহা বাঁচানর চেষ্টা

আজ দেশসুদ্ধ লোক মাটি হইতে রস সংগ্রহ না করিয়া পরগাছার মত ধনতন্ত্রের বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া টিকিয়া আছে। নিজের মরা-বাঁচার উপরে তাহারা সকল অধিকার হারাইতে বসিয়াছে। জগতের বাজারে যদি ধানের দর চড়ে, তবে চাষীর ভাগ্যে পয়সা জোটে, ছেলেমেয়েরা দুমুঠা খাইতে

পায়। কাপড়ের বাজার যদি চড়া হয়, তাহা হইলে পরনের কাপড় কমাইতে হয়, শীতের দিনে কষ্টের আর সীমা থাকে না, কোলের কাছে আগুনের মালসা লইয়া রাত কাটাইতে হয়! সম্বৎসর চাষীর হাতে কাজ থাকে না। সামর্থ্য বা ইচ্ছা থাকিলেও কাজ জোটে না। এমন পরমুখাপেক্ষী জীবনে সুখ কোথায়?

তাই আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় নূতন জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। পরগাছার মত ধনতন্ত্রের বিষবৃক্ষের ফল আহরণ না করিয়া মাটির রসে মানুষের সুস্থ কান্তি ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সেই নূতন জীবনের ব্যবস্থায় কেহ আর কাজের অভাবে কষ্ট পাইবে না। সকলে স্বাস্থ্যের অনুকূল খাওয়া পরা ও বাসস্থান লাভ করিবে। সমাজে উঁচুনীচু ভেদ থাকিবে না। গান্ধীজী মনে করেন, সকলের আয়ও সমান হওয়া উচিত। মুচী কামার কুমার সকলে গাঁয়ের জনসমূহের সেবা করে। ডাক্তার মোক্তার বা শিক্ষকও তাহাই করেন। কাহাকেও বাদ দিয়া সমাজ চলে না। এক পরিবারের মধ্যে যেমন কেহ একরকম কাজ করে কেহ অন্যরকম, সমাজের মধ্যেও তেমনই সকলে নিজের সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়া ভাই-ভাইয়ের মত বসবাস করিবে। আমি মাষ্টারি করি বলিয়া কামারের চেয়ে আমার রোজগার বেশি হওয়া উচিত নয়। পণ্ডিতকে মানুষে বেশি সম্মান করিতে পারে বটে, হয়ত বা পালাপার্বণে দুইটা কলামূলা বেশি দিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি বেচিয়া পণ্ডিতের পক্ষে অপরের চেয়ে বেশি লওয়া উচিত নয়। প্রকৃতি আমাদের সকলের উপর শরীর

খাটাইবার যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাহা এড়াইবার চেষ্টা ভাল নয়। তাহা অধর্মের পথ, অর্থাৎ মরণের পথ। তাহাই ধর্ম যাহা সমাজের জীবনকে ধরিয়া রাখে, রক্ষা করে। তাই স্বার্থের চিন্তা অধর্ম, নিজের গোষ্ঠীর লাভের চিন্তা অধর্ম। সমগ্রের কল্যাণের চিন্তা ধর্ম।

নূতন মন লইয়া নূতন চেষ্টা করার ফলে আমাদের গ্রামগুলিকে শহরের শোষণ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাবলম্বী পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে হইবে। যেখানে পরস্পরের মধ্যে বৃত্তির সহযোগিতা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে পুনরায় নূতন ধরণের বৃত্তি সৃষ্টি করিতে হইবে। গ্রামগুলি নবজীবনের সোনার কাঠির স্পর্শে আঁস্তাকুড় হইতে স্বাস্থ্যের আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইবে। মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা গ্রামের মধ্যেই গ্রামবাসীর আয়ত্তের ভিতরে থাকিবে। যে জিনিস গ্রামে হয় না, যে কাজ এক গ্রামের দ্বারা সম্ভব নয়, তাহার জন্য বিভিন্ন গ্রামের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সকলে ব্যবস্থা করিয়া লইবে। খালকাটার জন্য, নদীসংস্কারের জন্য গ্রামের প্রতিনিধিরা অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধির সঙ্গে এক হইয়া বিলিব্যবস্থা করিবেন। সেরূপ সহযোগিতায় কেহ শোষিত, কেহ শোষক থাকিবে না। সে সহযোগিতা সমানে সমানে স্বেচ্ছায় গড়িয়া উঠিবে। তাহাতে মঙ্গল হইবে, কল্যাণ হইবে। কিন্তু গ্রামবাসী প্রাণধারণের উপযোগী মোটা ভাতকাপড় এবং মোটামুটি শিক্ষার ব্যবস্থা সব নিজের আয়ত্তের অধীন রাখিবে।

ভবিষ্যৎ জীবনের যে অঙ্কুরের ছবি উপরে আঁকা হইল, তাহা আমরা গড়িয়া তুলিব কেমন করিয়া, সে বিষয়ে

আমাদের সকলকে ভাবিতে হইবে, যথোচিত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

যে ভাই ও বোনের গল্প গোড়ায় করা হইয়াছে, সে ভাই ধুতুরার চারা বাঁচাইবার জন্য মজবুত বেড়া বাঁধিয়াছিল। অমন চেষ্টাকে আমরা খামখেয়াল বলি। ছেলেমানুষ ভাইটি, তাহার চেয়ে বেশি জানিবেই বা কোথা হইতে? যে নূতন জীবনের চারা আমরা ভারতভূমিতে রোপণ করিতে চাই, তাহা যেন সত্যসত্যই ভাল গাছের চারা হয়, নয়ত আগাছা নিড়াইয়া জমি তৈয়ারি করিতে বেড়া বাঁধিতে যে পরিশ্রম হইবে তাহার সবই পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবার আশঙ্কা আছে।

কেহ কেহ মনে করেন, গড়ার বিষয়ে এখন হইতে অত খুঁটিনাটি ভাবিবার দরকার নাই, কেননা সত্যকারের গড়া এখন সম্ভব নয়। আসল কাজ হইল বেড়া বাঁধা, আগাছার উচ্ছেদসাধন করা। অর্থাৎ নূতন জীবন গড়িবার ক্ষমতা আগে চাই এবং তাহা লাভের একমাত্র উপায় হইল, প্রথমে রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করা। কারণ সেই রাষ্ট্রশক্তি হাতে আছে বলিয়াই আজকার অধিকারীগণ ধনতন্ত্রকে জিয়াইয়া রাখিতে পারিয়াছে, সাধারণ মানুষের শোষণমুক্তির চেষ্টাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিয়াছে। অতএব রাষ্ট্রশক্তি শোষিত শ্রেণীর করায়ত্ত করাই প্রথম প্রয়োজন। কথাটি মিথ্যা নয়, কিন্তু কতখানি সত্য, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার।

বাংলায় প্রবাদ আছে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। তাই গাঁয়ে যখনই কোন বৃহৎ কর্ম হয়, তখনই বাছাই-করা

কয়েকজন লোকের উপর সব কাজের ভার আসিয়া পড়ে। সব গাঁয়েই এমন তুইচারজন লোক থাকেন যাঁহাদের হাতে গুরু দায়িত্ব দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সবাই মিলিয়া গণ্ডগোল করার চেয়ে তাঁহাদের আদেশ মানিয়া যদি বাকি লোকে চলে, তাহা হইলে সব কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়। সমাজের ব্যবস্থাও অতি বৃহৎ যজ্ঞবাড়ির কাজের মত। মানুষ সমাজের কাজ পরিচালনা করার জন্যই স্বেচ্ছায় পঞ্চায়ত গড়ে। কিন্তু ইতিহাসের কোনও সুদূর যুগে কয়েকজন শক্তিশালী লোক পঞ্চায়তের উপরে টেক্কা দিয়া রাষ্ট্র গড়িয়াছিলেন। যে কাজ সর্বজনের প্রতিনিধিবৃন্দের কাজ, রাষ্ট্র সেই কাজের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিল। সমাজের খাওয়া-পরা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, সবই ক্রমে ক্রমে নিজের আয়ত্তাধীন করিল। আমাদের দেশে গ্রাম-পঞ্চায়ত বা কামার-কুমারদের জাতিগত পঞ্চায়তগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হইলেও তাহাদের কাজ রাষ্ট্র অনেকাংশে সঙ্কুচিত করিয়াছিল। যাঁহারা রাষ্ট্র চালাইতেন, তাঁহাদের এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইতে লাগিল। ঐশ্বর্য মান প্রতিপত্তি সবই তাঁহাদের ভাগ্যে যথেষ্ট জুটিল, এবং এই ব্যবস্থাকে কায়েমী রাখিবার জন্য তাঁহারা দেশরক্ষার সম্পূর্ণ ভার, অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া দেশের জনসাধারণকে সেই বিদ্যা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য দেখিয়া অপর দেশের শক্তিশালী লোকে প্রলুব্ধ হইল, ভারতও পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে স্বীয় স্বাধীনতা হারাইয়া বসিল। এদেশের শাসকবৃন্দ শুধু নিজে মারা পড়িলেন

না, যে প্রজাবৃন্দকে ঠুঁটো করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারাও মারা পড়িল।

আজ যদি আমরা বাঁচিতে চাই, সত্যকারের স্ব-রাজ লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে সমাজ এবং রাষ্ট্র উভয় পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ অপরের হাতে তুলিয়া দেওয়া চলিবে না। তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করার ভারও ঠিকার চাকরের উপরে ন্যস্ত রাখিলে চলিবে না। আলস্যের আকর্ষণে বা ভয়ের বশে কল্যাণের যথার্থ পথ হইতে বিচলিত হইলে চলিবে না। আমরা ভুলিতে চাই না যে, রাজশক্তি বা রাজকর্মচারী দেশের সবটুকু নয়। যাঁহারা রাজ্য চালাইয়া থাকেন, তাঁহারা জনমতের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তি হইলেও অবশ্য বার বার বলিয়া থাকেন, তোমাদের কোন ভাবনা নাই। আমরা পটু ব্যক্তি, নিপুণ ব্যক্তি, দেশকে রক্ষা করিবার যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিয়াছি। তোমরা আমাদের উপরে বিশ্বাস রাখিও। সময়মত খাজনা দিও। দরকারমত খাটিয়া যাও, আমরা সব সামলাইব। কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার করিব না। কাজ হইল আমাদের, সেদিকে আমরা সজাগ দৃষ্টি রাখিব না তো কে রাখিবে? এইরূপ অবহেলার ফলেই ত একদিন আমাদের সর্বনাশ ঘটিয়াছে, পরাধীনতার ভূত ঘাড়ে চাপিয়া সমগ্র দেশকে হতশ্রী শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করিয়াছে। ঐ মায়ায় আর ভুলিতে চাই না। নূতন জীবনতরু ভারতভূমিতে আমরা রোপণ করিতে চাই, খামখেয়ালী ভাইয়ের মত তাহার চারিদিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের বেড়াটুকু বাঁধিয়াই ক্ষান্ত হইব না, বরং দিদির মত অনলস অম্লান

দৃষ্টি লইয়া সর্বদা তাহাকে ঘিরিয়া রাখিব। বেড়া হয়ত বাঁধিতে হইবে, রাষ্ট্র হয়ত বাদ দেওয়া চলিবে না, কিন্তু তাহা যতটুকু না করিলে নয়।

স্বাধীনতার চেয়ে স্ব-রাজ বড়। আজ স্বাধীনতা বলিতে বুঝি নিজেদের জাতির অধীন একটি রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র সমাজের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়। স্ব-রাজ বলিতে বুঝি এমন ব্যবস্থা, যেখানে প্রতি মানুষের স্বীয় জীবনের উপরে অধিকার অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ আছে। সমাজের বৃহৎ কাজ চালানোর জন্য সে অপর মানুষের সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করে এবং যে সহযোগিতার ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে, তাহা শাসন বা দণ্ডের দ্বারা মানুষকে চালায় না। সুবিধা হইবে, ইহা বুঝিয়াই সেখানে সকলে আনন্দিত চিত্তে নিজেদের হাতে গড়া বিধিনিষেধ মানিয়া চলে। এই স্বরাজের ব্যবস্থায় রাষ্ট্রও হয়ত থাকে, কিন্তু আজকার তথাকথিত 'স্বাধীন' রাষ্ট্রের মধ্যে যে অত্যধিক দণ্ডশক্তি রাষ্ট্রপতিদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা থাকিবে না। সমাজের নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব ছোট বড় পঞ্চায়তের মারফত চলিবে এবং সেই পঞ্চায়তগুলি কোনও শ্রেণীবিশেষের সুবিধার জন্য রচিত না হইয়া সমগ্রের কল্যাণচেষ্টাতেই কেবল নিযুক্ত থাকিবে। জোর বা দণ্ডের সাহায্যে মানুষকে গৃহপালিত পশুর মত পরিচালিত করিতে হইবে না। এমন সমাজে কোনও মানুষই প্রকৃতি-প্রদত্ত শারীরিক শ্রম বা শরীরযজ্ঞের দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবে না বলিয়া সেখানে শোষিত বা শোষকের স্থান আর থাকিবে না।

গঠনকর্ম ও শান্ত প্রতিরোধ

গান্ধীজী নূতন জীবন গড়ার যে পথ দেশবাসীকে শিখাইতেছেন তাহার নাম গঠনকর্ম, এবং তাহা রক্ষা করিবার যে নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন ও ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সহিত যাহার উন্নতিবিধান করিতেছেন, তাহার নাম শান্ত প্রতিরোধ। শান্ত প্রতিরোধের বিশেষত্ব হইল, ইহার দ্বারা নিরস্ত্র অতিসাধারণ স্ত্রী-পুরুষেও স্বীয় স্বরাজব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম করিতে পারে। ইহার বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

উপস্থিত, গান্ধীজী আমাদের গঠনকর্মের দিকে একান্তভাবে মনঃসংযোগ করিতে বলিতেছেন। দেশে সমস্যার ত অভাব নাই। অন্নবস্ত্রের অনটন, বেকারদশা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব, পরকে বাদ দিয়া নিজে লাভবান হইবার চেষ্টা, অপরকে ছোট করিয়া নিজে বড় ইহা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, সব মিলিয়া যেন জীবনের শস্যভূমিকে একেবারে আগাছায় ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভাল গাছের চারা বুনিলেও যেন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। রোগ অবশ্য পুরাতন, তবু হতাশ হইবার কিছু নাই। পরমহংসদেব বলিতেন, ঘরের ভিতরে হাজার বছরের অন্ধকার জমিয়া আছে, কিন্তু যে দিন গৃহলক্ষ্মীর মঙ্গলহস্তের প্রদীপ সেখানে জ্বলিয়া উঠে, সেই মুহূর্তেই যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত অন্ধকার নিমেষে ঘুচিয়া যায়। আমাদের দারিদ্র্য ও পরাধীনতার গ্লানি যত দিনের পুরাতনই হোক না কেন, যে মুহূর্তে আমরা ভাবিব, আজ হইতে আমরা স্বাধীন

হইব, জীবনের অচল জগন্নাথের রথকে সকলে একসঙ্গে উৎসাহের বশে ঠেলিয়া আবার সচল করিব, সেই ক্ষণেই অন্তরে সঙ্কল্পের সোনার কাঠির স্পর্শে মুখচোখের রঙ আমাদের সোনার দীপ্তিতে ভরিয়া উঠিবে।

ইহার জন্য চাই সাহস, চাই সঙ্কল্প, চাই ব্রতে নিষ্ঠা, চাই পরস্পরের মধ্যে অন্তরের ভালবাসা ও সহযোগিতা। যাহা নাই, তাহা গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রতি বৎসর আমরা মা দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি গড়িয়া তুলি। এবার স্বরাজ লাভের জন্য ভবিষ্যৎ সমাজের চিন্ময়ী মূর্তি গড়িয়া তুলিব। আমরা গড়িতেও পারিব, সকলে মিলিয়া মরণের বীর্যের দ্বারা তাহা রক্ষাও করিতে পারিব। কোনও কারণে শুধু রাষ্ট্রের উপরে গড়া বা রক্ষা করার সকল ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইব না।

হিন্দীভাষায় একটি সুন্দর গান আছে। তাহার কয়েক ছত্র এইরূপ—

উঠ জাগো মুসাফির ভোর ভৈও।
অব রৈণ কঁহা যো শোয়ত হৈ॥
যো শোয়ত হৈ সো খোয়ত হৈ।
যো জাগত হৈ সো পাওয়ত হৈ॥

হে যাত্রী, ভোর হইয়াছে। রাত্রি আর কোথায় যে এখনও শুইয়া আছ? যে ঘুমাইয়া থাকে তাহার সব খোয়া যায়। যে জাগিয়া থাকে সে-ই সাধনার ধন লাভ করে। তবু তুমি ঘুমাইয়া থাক কেন? ওঠ, জাগ, ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গঠনকর্মের মূল উদ্দেশ্য কি

উৎসাহের জোয়ার ভাটা

গড়ার কাজে উৎসাহ চাই, এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু আলস্য যেন আমাদের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়া আছে। আমাদের বাল্যকালে সংসারে খাওয়াদাওয়ার যে সচ্ছলতা ছিল আজ আর তাহা নাই। আজ অনেকের ঘরে টাকার সচ্ছলতা হইয়াছে বটে, কিন্তু খাওয়াপরার জিনিসের স্বাচ্ছন্দ্য ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর হইতেই যেন ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। টাকার দাম কম বেশি হওয়ার ফলে কখনও মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী কষ্ট পায়, কখনও বা চাষীদের কষ্ট হয়। কিন্তু মোটের উপর দেশের মধ্যে দারিদ্র্যের মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৩৯ সাল হইতে সমগ্র পৃথিবীর উপরে যে ভয়াবহ দুর্দিনের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার ফলে শুধু যে যুদ্ধের চোটেই মানুষ মারা গিয়াছে তাহা নয়, অনাহারে এবং রোগভোগ করিয়াও লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে। কতদিনে যে এই অবস্থার অবসান ঘটিবে, সে কথা আজ কেহ ভরসা করিয়া ভাবিতেও পারে না।

১৯২০ সালে যখন প্রথম ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, তখনই গান্ধী মহারাজ ব্যাপকভাবে চরকাচালানোর কথা বলিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, দেশের লোক অন্তত বস্ত্রের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইয়া উঠুক। বিলাতী বর্জনের দ্বারা ইংরেজ জাতিকে জব্দ করিবার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না।

তিনি বলিয়াছিলেন, মানুষে যেমন নিজের নিজের বাড়িতে ভাত খায়, তেমনই ভাবে যদি সুতা কাটিয়া গ্রামের তাঁতীকে দিয়া বুনাইয়া নিজের কাপড়ের বন্দোবস্তটুকু করিয়া লয়, তাহা হইলে বৎসর বৎসর বিদেশে আমরা কাপড় খরিদ করিবার জন্য যে ৬০ কোটি টাকা পাঠাইয়া থাকি, তাহা দেশের মধ্যে থাকিয়া যাইবে এবং জনসাধারণ কাজের অভাবে দারিদ্র্য ভোগ না করিয়া খানিকটা লাভবান হইবে। তিনি আরও মনে করিয়াছিলেন, যদি ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামে চরকা স্থায়ী আসন লাভ করে, তাহা হইলে মানুষের উৎসাহ বাড়িবে এবং ক্রমে ক্রমে তাহারা কাপড় ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য যাবতীয় জিনিসপত্র গ্রামের মধ্যে অথবা কাছাকাছি গড়িয়া লইবার বন্দোবস্ত করিবে। ফলে সকলের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি ঘটিবে এবং স্বাবলম্বনের শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু গান্ধীজী ঠিক যেমনটি চাহিয়াছিলেন তেমনটি ঘটে নাই। প্রতিবার আন্দোলনের সময়ে কিছুদিনের জন্য জনসাধারণের মনে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। যে সকল কর্মী রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন, তাঁহাদিগকে নানাবিধ নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। অবশিষ্ট সকলে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া কেহ চরকা ধরেন, কেহ সিগারেটের পরিবর্তে বিঁড়ির অভ্যাস করেন, দেশে বিদেশী জিনিসের বিক্রয় কমিয়া যায়, সকলের মধ্যে বিলাসিতাবর্জনের একটি শুভ আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসে, তখন আবার পুরান

অভ্যাসগুলি একে একে ফিরিয়া আসে, মানুষ সস্তার কাপড় খোঁজে, নিজে ব্যবস্থা করিয়া সুতা কাটিয়া কাপড় করার কথা ভুলিয়া যায়। কর্মীরা চেষ্টা করিলেও তখন চরকা সম্বন্ধে উৎসাহ জাগাইতে পারেন না। কেবল যাহারা নিতান্ত গরিব, তাহাদের মধ্যে দিনে দুই-এক আনা রোজগারের আশায় চরকা টিকিয়া থাকে। কিন্তু সেই গরিবেরা পয়সার জন্যই সুতা কাটে, নিজেদের পরনের জন্য নয়। সেই কাপড়ও শহর-বাজারেই বিক্রয় হয়। যাঁহাদের মনে স্বদেশী ব্রতে নিষ্ঠা অবিচল থাকে, তাঁহারা বেশি দাম দিয়াও খাদি কেনেন, ফলে কয়েকজন গরিব দিনান্তে দুইমুঠা অন্নের আস্বাদ পায়। কিন্তু গান্ধীজী ঠিক এমনধারা খাদি বা এরূপ গঠনকর্ম চান নাই। তিনি কি চান, সেই কথাটি বুঝাইবার জন্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি ইতিহাস দিয়া আরম্ভ করিব।

খাদি-সংঘের ইতিহাস

১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুর সহরে খাদি-সংঘ নামে একটি ক্ষুদ্র দোকান খোলা হয়। প্রথমে এখানে কলিকাতা হইতে আনা কিছু চরকা এবং খাদি বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই অবস্থাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে খাদি-সংঘের সহিত যুক্ত হই। অল্পদিনের মধ্যে খাদি-সংঘের কর্মীরা খাদি উৎপাদনের সংকল্প গ্রহণ করিলেন। দেশে তখন বিরাট সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিতেছে, অর্থের অভাব হইল না। অল্প চেষ্টায় শহরে সাত শত টাকা

চাঁদা উঠিল, এবং সেই টাকার সাহায্যে বোলপুরেই চরকা এবং টাকু তৈয়ারি, সুতা কাটা, বোনা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইল। এক, তুলার গাঁট খরিদ করা ছাড়া বাহিরের উপর আর নির্ভর করিতে হয় নাই।

আন্দোলনের প্রথম ঝোঁক কাটিয়া যাওয়ার পর খাদি সম্বন্ধে একে একে নানাবিধ প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, খাদি পড়তায় পোষায় কি না, ঐ সময়ে আরও লাভজনক কাজ করিলে দোষ কি, ইত্যাদি। সংঘের কর্মীরা সকলকে বুঝাইতেন, অধিক লাভের কাজ পাওয়া গেলে সেই কাজ করাই ভাল। কিন্তু না পাইলে অবসর সময়টুকু অপচয় না করিয়া যদি সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে পরনের কাপড়খানা পাওয়া যায়, সেটা কি কম লাভের কথা? যাঁহারা চরকা ছাড়েন নাই, তাঁহারা ইহা স্বীকার করিতেন এবং কয়েকজন উৎসাহী দোকানী দোকানে বসিয়াই দ্বিতীয় বৎসর দুর্গাপূজার পূর্বে তিন চার মাসের মধ্যে তিন খানা হইতে ছোট বড় তের খানা পর্যন্ত কাপড়ের মত সুতা কাটিয়া লইয়াছিলেন। ফলে বোলপুর শহরে গৃহস্থদের অন্তত এইটুকু ধারণা হইয়াছিল যে নিজেদের পরনের কাপড়ের মত সুতা যে কোন গৃহস্থ অনায়াসে কাটিয়া লইতে পারে, কেবল চেষ্টা থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, খাদি বিক্রয় করিবার জন্য কোন বাজার খুঁজিতে হয় না, সর্বত্র ইহা বিক্রয় করা সম্ভব। বিক্রয় না হইলেও অন্তত নিজে ব্যবহার করা চলে।

খাদি-সংঘের পক্ষ হইতে কয়েকটি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। যতগুলি চরকা চলিত, কর্মীরা প্রতিদিন নিজের নিজের

এলাকায় ঘুরিয়া সেগুলিকে চালু রাখিতেন। মালদড়ি ঠিক রাখা, টাকুর টাল ভাঙ্গিয়া দেওয়া, সুতা গুটানোর সম্বন্ধে সাবধানতার বিষয়ে সব সময়েই তাঁহারা দৃষ্টি রাখিতেন! সুতা বুনানোরও সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ফলে খাদি-সংঘের কাজ বেশ ভালভাবেই চলিতে লাগিল।

দুই বৎসর চলার পর দেশে আবার ধরপাকড় শুরু হইল। তখন কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন কারারুদ্ধ হইলেন এবং খাদির কাজও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। জেলে থাকাকালীন আমার মনে গান্ধীজীর খাদি সম্বন্ধে উপদেশগুলি বিশেষভাবে আলোড়নের সৃষ্টি করে। কোনও গ্রামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা অনেকের পক্ষে খুব কষ্টকর নয়। হয়ত প্রথমে সর্বত্র বাহিরের অর্থবল অথবা বুদ্ধিবলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কাজকে চালু রাখার জন্য স্থানীয় লোকেরা যদি সর্বদা বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকে তাহা হইলে ত চলে না। নিজের কাজকে সত্যসত্যই নিজের করিয়া চালাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে, মুক্তি পাইবার পর যখন বোলপুরে ফিরিয়া গেলাম তখন প্রথম হইতেই ইচ্ছা হইল, নিজে বিশেষ কিছু না করিয়া স্থানীয় কর্মীদের চেষ্টাকেই জাগ্রত করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোথাও না কোথাও গলদ থাকার ফলে মনের মত সাফল্য লাভ করিতে পারি নাই। আমি উপস্থিত থাকিলে কর্মীগণের মধ্যে যে কর্মতৎপরতা দেখা যাইত, অপর সময়ে তাহা টিকিত না। ফলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হইতে লাগিল, কাজও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। হয়ত বাহিরের লোকবলের দ্বারা কাজটিকে পূর্বের

মত বজায় রাখা চলিত, কিন্তু সে'তো রোগ সারিবার লক্ষণ নয়, ঔষধের জোরে রোগীকে জীয়াইয়া রাখিবার ব্যবস্থা।

ঠিক কোন্ উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে আলস্য ও পরনির্ভরশীলতাকে স্থায়ীভাবে দূর করা যায় জানি না, কিন্তু এ কথা বুঝি যে এই তমোভাবকে দূর করিতে না পারিলে মানুষের চরিত্রের বর্তমান অবস্থার উপর কোনও স্থায়ী কল্যাণের সৌধ রচনা করা আদৌ সম্ভব নয়।

গঠনকর্মের মূল উদ্দেশ্য

গান্ধীজীকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল, মানুষের আত্ম-শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে, তমোভাব দূর করিবার জন্য, রাজসিক শক্তির আশ্রয় লওয়া চলে কি না। মানুষ কি একেবারে সাত্ত্বিক হইতে পারিবে? খাদি এবং কুটিরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলে গাঁয়ের লোকের খানিক আর্থিক উন্নতি সম্ভব। যদি তাহারা এই কাজকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে এবং নিজে চালাইতে থাকে, তাহা হইলে গ্রামের কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে যেরূপ দৃঢ় নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহার উপযুক্ত উৎসাহ ত দুর্লভ। তাই খাদির কাজের পরিবর্তে আমরা যদি মানুষকে খণ্ড খণ্ড সংগ্রামে উৎসাহিত করি এবং সেই সুযোগে উত্তরোত্তর সংঘবদ্ধ করিয়া তুলি, তাহা হইলে দোষ কি? জমিদার মহাজন অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রজার নিকট হইতে যে মুনাফা আদায় করেন, প্রজার পক্ষে তাহার তুলনায় যৎসামান্য লাভ হয়। এগুলির হারি

কমানোর চেষ্টায় মানুষকে সহজে সংঘবদ্ধ করা যায় এবং উৎসাহের সঙ্গে তাহারা সংগ্রামও করিতে পারে। খাদি উৎপাদন বা কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠানে আর্থিক লাভ আছে বটে, কিন্তু অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষের মন যেমন সহজে সাড়া দেয়, খাদির কাজে তাহা সম্ভব নয়। অতএব গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হইল, খাদির মারফত আত্মশক্তি জাগানো অপেক্ষা খণ্ডযুদ্ধের সাহায্যে সেই চেষ্টা করা কি ভাল নয়?

উত্তরে গান্ধীজী যাহা বলেন সেটি আমাদের সকলের প্রণিধানের যোগ্য। তাঁহার কথা হইল, অহিংস বিপ্লবের জন্য যে-জাতীয় শক্তির প্রয়োজন, গঠনকর্মের বিবিধ কাজের ভিতর দিয়াই তাহা আমরা সম্যক্‌ভাবে সৃজন করিতে পারি। খণ্ডযুদ্ধে মানুষের উৎসাহ আশু দেখা দেয় সত্য, কিন্তু এরূপ উৎসাহের উপরে আমরা অত্যধিক নির্ভর করিতে পারি না। সচরাচর মানুষের অত্যাচার নিরোধের চেষ্টা দমকা আসে, দমকা যায়। সেইজন্য তাহারা অপরের উপর দৈনন্দিন রাষ্ট্রচালনার ভার দিয়া রাখে, অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইলে তখন অতিষ্ঠ হইয়া বিপ্লব বাধায়। আবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে না ঘটিতে ঝিমাইয়া পড়ে। এই মনোভাব যতদিন থাকিবে ততদিন প্রকৃত স্ব-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। স্বরাজের সৌধ শুধু অবিচল জাগ্রত মনোভাবের উপরেই গড়িয়া তোলা সম্ভব।

গ্রামকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টায়, যাবতীয় সামাজিক বৈষম্য ও দুর্নীতিকে আইনের পরিবর্তে জনশিক্ষার দ্বারা স্থায়ীভাবে দূরীভূত করার চেষ্টায়, আমরা সেই স্বাবলম্বী মনোবৃত্তির সৃজন করি।

স্বাবলম্বী স্বয়ং-সম্পূর্ণ সামাজিক ভেদবৈষম্যবিহীন গ্রামগুলি আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজের অঙ্কুর। বর্তমান অত্যাচার নিবারণের জন্য গ্রামের মানুষকে দলবদ্ধ করিবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া আমরা খাদির কথা বলি না। খাদির লক্ষ্য তদপেক্ষা মহৎ। আঠার দফা গঠনকর্মের দ্বারা আমরা যে স্বরাজের আদর্শ গড়িতে চাই, সেখানে সকলে আলস্য পরিহার করিবে, বুদ্ধি বিক্রয় করিয়া কেহ রোজগার করিবে না। সকলেই কায়িক শ্রমের দায়িত্ব স্বীকার করিবে। ধনী নির্ধন ভেদ থাকিবে না। সকলে স্ব স্ব ক্ষমতাকে সর্বজনের কল্যাণের নিমিত্ত সাধ্যমত প্রয়োগ করিবে। তখন সকলের অধিকার সমান হইবে, অর্থাৎ অপরের কোন ক্ষতিসাধন না করিয়া সকলে স্বীয় অন্তরের বৃত্তিগুলিকে বিকশিত করিবার মত সুযোগ লাভ করিবে।

গান্ধীজা আরও বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যদি আমরা নানাবিধ খণ্ডসংগ্রামে লিপ্ত হই, তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষময় জনসাধারণের মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইবে। আমাদের গঠনকর্মচেষ্টার মধ্যে একটি লক্ষ্য স্থির থাকা প্রয়োজন। আমরা ভবিষ্যতে যে সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাই, তাহার প্রতি দৃষ্টি যেন অচঞ্চল থাকে, আমাদের সকল কর্ম যেন তাহারই অনুকূল হয়। গড়ার কাজ যদি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে তবে তাহার বিরোধী শক্তিগুলি আমাদের উদাসীনতা এবং সহযোগিতার অভাবে আপনিই ক্ষয়-প্রাপ্ত হইবে, পৃথক্‌ভাবে বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রামের হয়ত প্রয়োজনই হইবে না।

অতএব ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজ সংগঠন করিতেছি, তাহার ভিত্তি-স্বরূপ মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধনে সহায়তা করিতেছি, এই বুদ্ধি লইয়া কর্মীগণকে অগ্রসর হইতে হইবে।

কর্মীদের প্রতি নির্দেশ

গঠনকর্মের উদ্দেশ্যকে স্বীকার করিলে কর্মীদের দায়িত্ব অতিশয় বৃদ্ধি পায়। যেখানে কোনও কর্মী সংগঠনের চেষ্টা করেন সেখানে তাঁহাকে প্রথমে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয় সত্য। এরূপ চেষ্টার ফলে সচরাচর তাঁহার কতকগুলি ঐশ্বর্যলাভ হয়। লোকে তাঁহার কথা মানে, তাঁহার যশঃপ্রাপ্তি হয়, হয়ত বা গুরুতর দায়িত্ব অর্পণ করিয়া লোকে তাঁহাকে সম্মান করে। কিন্তু যদি এই বিভূতির দ্বারা তিনি আবদ্ধ হন তবে মূল বস্তু হইতে তাঁহার দৃষ্টি সরিয়া যায়, মানুষের আত্মশক্তিকে জাগানোর চেষ্টাও ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসে। পরমহংসদেব যোগ-সাধনের সম্বন্ধে বলিতেন, যোগী কিছুকাল সাধনার পর অণিমা লঘিমা প্রভৃতি যাবতীয় সিদ্ধির অধিকারী হন। কিন্তু যদি এই সিদ্ধাইএর লোভ নষ্ট করিয়া আরও অগ্রসর হইবার মত অধ্যবসায় তাঁহার না থাকে তবে যোগীর পক্ষে অবশেষে পতন অনিবার্য।

দেশসেবার সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে। ইহাও ত এক-প্রকার সাধনা। আমরা শুধু নিজের সিদ্ধি চাই না, জগতের সর্বজন দুঃখের সাগর অতিক্রম করিতে সমর্থ হোক, ইহাই আমাদের চরম লক্ষ্য। কিন্তু সে পথে পরের উপর নির্ভর করা চলে না। স্বরাজের উপযোগী আত্মশক্তির বিকাশ সাধন করিতে

গিয়া যদি আমরা ঐশ্বর্যের মধ্যে নিজে আবদ্ধ হই তবে জনগণের আত্মশক্তি জাগিবে কেমন করিয়া? যে প্রতিষ্ঠান আমাদের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে, অবশেষে লোকে যেন আমাদিগকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া, আমাদের ভুলিয়া গিয়া, নিজেরা নিজের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে চালাইতে পারে। তবেই আমাদের কাজ পরিপূর্ণ হইবে। আমরা স্বীয় জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য দিয়া গঠনকর্মে সহায়তা করিব সত্য, কিন্তু শেষে যেন আমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাই। বাড়ি তৈয়ারির সময়ে ভারা বাঁধিতে হয়, কিন্তু তৈয়ারি শেষ হইলে ভারার চিহ্নমাত্র থাকে না।

জলের নিজের কোনও আস্বাদ নাই, কিন্তু তাহাতে যখন মিছরির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, জল হইতে তাহাকে আলাদা করিয়া দেখা যায়, ততক্ষণ সে জলে গলে নাই। আমরাও গঠনকর্মের মধ্যে যদি জনসাধারণ হইতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলি, বাহিরের টাকার উপরে, বাহিরের বাজারের উপরে, বাহিরের লোকবলের উপরে নির্ভর করি, অথবা জনগণের মধ্যে থাকিয়াও পদগৌরব লাভের দ্বারা তাহাদের উর্ধ্বে আসন রচনা করি, তাহা হইলে মিছরির দানার মত আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকিবে। জনসাধারণের জীবনকে আমরা গলিয়া গিয়া সমৃদ্ধ করিতে পারিব না। একটি বাউল গানে আছে—

প্রেমে জল হয়ে যাও গ'লে ॥
কঠিনে মেশে না সে।
মেশে সে তরল হ'লে ॥

ইহাই যেন আমাদের গঠনকর্মের মূলমন্ত্র হয়। তবেই হয়ত

জগতের দরিদ্র বঞ্চিত মানুষ কোনদিন সত্যসত্যই মুক্তির আস্বাদলাভে সমর্থ হইবে।

একটি প্রশ্ন

পাঠক হয়ত বলিবেন, আচ্ছা, কি উদ্দেশ্য লইয়া গঠনকর্মে অগ্রসর হইব, তাহা না হয় বুঝিলাম। কিন্তু আমরা যাহা চাই, তাহা কি সব সময়ে পাওয়া যায়? নানারকম বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার কোনটি ভিতরের কোনটি বা বাহিরের। একে একে এগুলির মীমাংসা হওয়া দরকার। আজ প্রথমে একটি প্রশ্ন করি।

সে প্রশ্ন হইল এই যে, ১৩৫০ সালে বাংলা দেশে যখন মন্বন্তর চলিয়াছিল, মানুষ যখন ৩০।৪০ টাকা দিয়াও এক মণ চাউল কিনিতে পারে নাই, বাজারে যখন একখানিও পরনের কাপড় ছিল না, তখন চরকার দিকে মন দেওয়া হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু আবার যখন জিনিসপত্র সস্তা হইবে, তখন কি গৃহস্থ চরকার পাট তুলিয়া দিবে না? আমরা যদি বা জিদের বশে তখনও চরকার দ্বারা বস্ত্রের সংস্থান করি, চাষের সাহায্যে খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া লই, অন্যান্য দেশে কত অল্প পরিশ্রমে কলকব্জার সাহায্যে মানুষ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা তখন কি বিচলিত হইব না? সে অবস্থায় চরকার প্রতি আমাদের অনুরাগ কখনও টিকিতে পারে কি?

ইহার উত্তরে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, গান্ধীজী যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসংগঠনে কথা বলেন, তাহার অর্থ এ নয় যে,

মানুষ বহির্জগতের দিকে ফিরিয়া তাকাইবে না, কেবল কলুর বলদের মত চোখে ঠুলি বাঁধিয়া মোটা ভাতকাপড়ের ঘানির চারিদিকে চিরকাল অন্ধের মত ঘুরিয়া মরিবে। আজ জগতে নানাবিধ কলকারখানা চলিতেছে, জিনিসপত্র গড়িতে আগের যুগ অপেক্ষা মানুষ অল্প পরিশ্রম করে, ইহার সবই সত্য। কিন্তু কলকারখানার মারফত একটি অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। আগে মানুষের খাওয়া-পরা ব্যাপারটি অনেকাংশে তাহার আয়ত্তের অধীন ছিল। শাসকবর্গ প্রজার উপর অত্যাচার করিলেও দেশসুদ্ধ লোককে অন্নবস্ত্রের অভাবে মরণের দুয়ার পর্যন্ত ঠেলিয়া দিতে পারিতেন না। কিন্তু যন্ত্রযুগের ব্যবস্থাই এমন যে দেশের সমস্ত লোকের খাওয়া এবং পরার, এক কথায় বাঁচিয়া থাকার, কলকাঠি শহর-বাজারের বাসিন্দা জনকয়েক শক্তিশালী মানুষের হাতে সমর্পিত হইয়াছে। যাহারা ধনবলে বা বুদ্ধিবলে বলীয়ান, যাহাদের নিকট অস্ত্রবল থাকায় সমগ্র শাসনভারও করায়ত্ত হইয়াছে, তাহাদের হাতে এখন দেশের জীয়নকাঠি মরণকাঠি দুটিই ন্যস্ত রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে, সৎলোক হইলে, তাহারা অপরকে যন্ত্রযুগের সুবিধার কিয়ৎপরিমাণ প্রসাদ দিতে পারে। কিন্তু নিজেরা বিপন্ন বোধ করিলে তাহারা প্রয়োজনমত সমস্ত দেশের মানুষকে কলের পুতুলের মত কখনও উঠায়, কখনও বসায়, কখনও যুদ্ধ করায়, এবং যখন যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ কথাও বলায়।

এ অবস্থা যে শুধু ভারতবর্ষ চীন বা আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে আবদ্ধ তাহা নয়। ইংলণ্ড-আমেরিকার মত ধনী দেশেও

গরিবের অধিকার একই রকম। নামেই তাহাদের ভোট আছে, পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে। কিন্তু নিজের জীবনের উপরে, খাওয়াপরার উপরে অধিকার আমাদের দেশেও জনসাধারণের নাই, ইংলণ্ড-আমেরিকাতেও নাই।

যদি এই অবস্থা হইতে বাঁচার জন্য আমাদিগকে আপাতত মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থাটুকু নিজের চেষ্টার দ্বারা গড়িয়া তুলিতে হয়, এবং যদি সেই ব্যবস্থা সত্যই আমাদের আয়ত্তের অধীন থাকে, তাহা হইলে কি কম কথা? পরাধীন অবস্থায় কোনও দিন সুখে কোনও দিন দুঃখে কাটে। কিন্তু শক্তিশালীর প্রসাদভিক্ষু হওয়ার চেয়ে স্বাধীনভাবে, কিছু বেশি পরিশ্রম করিয়াও বাঁচিয়া থাকা কি ভাল নয়? স্বাধীনতা কি অমূল্য সম্পদ নয়?

উত্তরে পাঠক হয়ত বলিবেন, তাহার প্রয়োজন কি? ধনোৎপাদনের যাবতীয় সরঞ্জাম জনকয়েক মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া আছে বলিয়াই আজ এত দুঃখ, এত দুর্দশা। সেই সরঞ্জামগুলি যদি সর্বজনের অধিকারে আসে, পঞ্চায়তের অধীনে মাহিনাকরা কর্মচারীর দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে আমরা যন্ত্রযুগের সুখভোগ করিতে পারিব, অথচ বর্তমানের অসুবিধাগুলি ভোগ করিতে হইবে না।

গান্ধীজী ইহার উত্তরে বলিতেন, ঠিক কথা। আমিও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুকে সর্বসাধারণের সম্পত্তি করিতে চাই। কিন্তু সেগুলিকে ব্যক্তির বা শ্রেণীবিশেষের অধিকারমুক্ত করিয়া সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করার পথ,

আমার পক্ষে স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রের শক্তির সাহায্যে এই বিপ্লবসাধন করার চেয়ে জনসাধারণের অহিংস-অসহযোগের দ্বারা আনীত বিপ্লবের মারফত আমি এই পরিবর্তন ঘটাইতে চাই। ধনোৎপাদনের উপাদানও অবশেষে রাষ্ট্রের অধিকারে থাকার চেয়ে আমি বে-সরকারী পঞ্চায়তের অধিকারে রাখার পক্ষপাতী।

রাষ্ট্র এবং পঞ্চায়তের মূলে যে প্রভেদ আমি দেখিতে পাই, তাহা বলিতেছি। পঞ্চায়তের হাতে মানুষ শুভবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া ক্ষমতা সঁপিয়া দেয়, শাসন করার অস্ত্র তাহার যৎসামান্য থাকে, মানুষকে রাজি করাইয়াই পঞ্চায়ত বেশির ভাগ কাজ চালাইয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের পীড়নের ক্ষমতা অসীম। যাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তাঁহারা নিপীড়ন করিয়া বা শাসনের ভয় দেখাইয়াই কাজ হাসিল করিয়া লন। এই নিপীড়নেই আমার বিশেষ আপত্তি। মানুষকে বাঁচিতে হইলে সমাজ গড়িতে হয়, প্রতিষ্ঠান গড়িতে হয়। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠান এমন হওয়া প্রয়োজন যাহা নিপীড়নের উপরে প্রধানত নির্ভর করে না। তেমন প্রতিষ্ঠানের হাতে ধনোৎপাদনের ব্যবস্থাকে সঁপিয়া দিলে ত ভালই হয়। মানুষের খাওয়াপরার সরঞ্জামের উপর কোন ব্যক্তির মালিকানা স্বত্ব থাকা উচিত নয়, প্রকৃতির জলবায়ুতে যেমন সকলের সমান অধিকার থাকা উচিত, এ বিষয়েও তেমনই।

পঞ্চায়তের হাতে যদি মালিকানা স্বত্ব তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই সব সমস্যা মিটিয়া যাইবে, ইহা কেহ বলে না। এইজন্য আমি চাই, জনসাধারণ যেন সকল অবস্থাতেই কেন্দ্রীয়

কর্মচারীবৃন্দকে শাসনে সংযমে রাখিতে পারে। স্বাধীনতার মূল অর্থ আমি ইহাই বুঝিয়াছি যে, সেখানে মানুষ সমাজের কাজ নির্বাচিত প্রতিনিধির সাহায্যে চালায় বটে, কিন্তু ক্ষমতার অপপ্রয়োগকে সংযত করার শক্তি সর্বদা নিজের আয়ত্তের অধীনে রাখে। যদি মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা মানুষ কোন সময়েই পরের হাতে তুলিয়া না দেয়, তাহা হইলে এইটি সম্ভব হয়। তাহার পর সুখস্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির জন্য কলকব্জা যতটুকু সত্যসত্যই প্রয়োজন, তাহা কেন্দ্রীয় পঞ্চায়তের অধীনেও দিতে আপত্তি নাই। জগতের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যদি কেন্দ্রগত কোন ব্যবস্থা করে, তাহাতেও আপত্তি নাই। জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ভবিষ্যতের জন্য এমনই এক আদর্শের বিষয়ে চিন্তা করেন, যেখানে প্রতি দেশ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছে। কেন্দ্রীকরণকেই আমি ভয় পাই না, তবে সে কেন্দ্রীকরণ স্বেচ্ছায়, সমানে সমানে, মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারা শাসিত হইবে। যে কেন্দ্রীকরণ অসমান শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নিপীড়নের সাহায্যে গড়িয়া ওঠে, তাহার চেয়ে ভয়াবহ বস্তু আর কিছু নাই। বিকেন্দ্রীকরণের রস দিয়াই তাহাকে জীর্ণ করিয়া মঙ্গলজনক পদার্থে পরিণত করা সম্ভব।

পাঠকের নিকট গান্ধীজীর যুক্তি তাঁহার নিজের ভাষায় দিলাম না বটে, কিন্তু যুক্তিগুলি সবই গান্ধীজীর বিভিন্ন সময়ের লেখা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

পাঠকের প্রথম প্রশ্নের উত্তর তাহা হইলে মোটের উপর

ইহাই দাঁড়াইল যে যদিও সচরাচর মানুষ অল্প আয়াসের পথ খোঁজে, মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা যদিও বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধতায় নিজের করায়ত্ত করা যথেষ্ট আয়াসসাধ্য, তবু সত্যকারের স্ব-রাজ সাধনার জন্য মানুষকে এ চেষ্টা করিতেই হইবে। স্বাধীনতা বস্তুটি যেমন দুর্লভ, তাহার মূল্যও তেমনই বেশি। হঠাৎ দুইদিনের ঝোঁকে হয়ত একদল লোককে শক্তির আসন হইতে তাড়াইয়া আর একদল পছন্দসই লোককে সেখানে বসানো যায়, কিন্তু মানুষ যদি তাহাদের হাতে মরণবাঁচনের সব ভার তুলিয়া দেয়, সুতরাং তাহাদিগকে সংযত করিবার ক্ষমতা খোয়াইয়া বসে, তবে কেন্দ্রীয় শক্তির অপপ্রয়োগ ঘটিতে বিলম্ব হয় না। অসংহত শক্তির মাদকতায় ভাল মানুষও মন্দে পরিণত হয়। সেই কারণে আর্থিক শক্তিই হোক অথবা রাষ্ট্রীয় শক্তিই হোক, যথাসম্ভব ছড়াইয়া রাখা ভাল। বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান যুক্তি তাহাই, অতএব জনসাধারণের স্বরাজসাধনার সহিত ইহার একান্তভাবে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রহিয়াছে।

গান্ধীবাদ সম্বন্ধে তর্ক

পাঠক। একটা কথা মশাই, আমাদের মাথায় ঢোকে না। আজকের যুগে গান্ধীভক্তেরা চরকা চালাবার চেষ্টা করছেন কেন? যন্ত্রের সুবিধা ত্যাগ ক'রে চরকা বা গরুর গাড়ির যুগে কি ফিরে যাওয়া উচিত হবে?

মানুষ যখন নিজের হাতের জোরে বা গাই-বলদের সাহায্য

ছোটখাট কল চালিয়ে নিজের ব্যবহারের সামগ্রী তৈরি ক'রে নিত, আজ পৃথিবী তা থেকে অনেক এগিয়ে এসেছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়েছে, মানুষের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন অবস্থায় পুরান যুগে ফিরে যাওয়া দু-চারটা দেশের পক্ষে হয়তো আজও সম্ভব। কিন্তু সবাই ধনবৈষম্য দূর করতে গিয়ে যদি গরুর গাড়ির যুগে ফিরে যায়, তা হ'লে সবাই গরিব হয়ে যাবে না কি? ধনবৈষম্য দূর করার জন্যে কি সকলকে গরিব হ'য়ে সমান হতে হবে?

লেখক। আপনার প্রশ্ন সঙ্গত এবং গান্ধীজীর পক্ষ থেকে এর উত্তর দেওয়া কঠিন। কিন্তু উত্তর আছে। আপনাকে দেবার চেষ্টা করব।

জীবজন্তুর শক্তির দ্বারা যখন কল চালানো হ'ত, মানুষ নিজের বাহুবলের দ্বারা যখন কাপড় বুনত, লোহার অস্ত্র নির্মাণ করত, তাতে সকলের অভাব মিটত না সত্য। আজ কয়লা বা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে মানুষের অভাব মেটানোর সামগ্রী অনেক বেশি পরিমাণে নির্মিত হয়। কিন্তু কলের ফলে সব শিল্পই বড় বড় শহরে কেন্দ্রীভূত হয়ে চলেছে, গ্রামে যারা থাকে তাদের মজুরিবৃত্তি ছাড়া আর কিছু বাকি থাকে না, ধনবৈষম্যের পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাঠক। এ কথা বর্তমান যুগের চিন্তাশীল অনেকেই স্বীকার ক'রে থাকেন। যুদ্ধের সময়ে কেন্দ্রীভূত শিল্প থাকলে শত্রুর বোমার আঘাতে তার ধ্বংসের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ব'লে আজ শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ তো আপনিই হচ্ছে।

আর কয়লার বদলে বৈদ্যুতিক শক্তির উপরে নির্ভর করলে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ তো সহজেই হতে পারে। গ্রামের লোক শুধু মজুর না হয়ে নিজের স্বাধীন কারিগরী বৃত্তিতে পুনরায় ফিরে যাবে, কিন্তু গান্ধীজীর চরকা-খদ্দরের উপর এত জোর কেন?

লেখক। গান্ধীজী চরকাকে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের সর্বোত্তম নমুনা ব'লে মনে করতেন। বিকেন্দ্রীকরণেই তাঁর ঝোঁক ছিল। যদি বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার ক'রে মানুষ অল্পায়াসে প্রয়োজনীয় বস্তু রচনা করে এবং সেই বিদ্যুতের কেন্দ্র যদি রাষ্ট্রশক্তির অধীনে বা গ্রামপঞ্চায়তের অধিকারে থাকে, তাতে তিনি খুশিই হবেন—এই রকম কথা লিখে গিয়েছেন।

আসল কথা হ'ল, বিকেন্দ্রীকরণ। তার মধ্যে তিনি দুটি প্রধান গুণ দেখতেন। উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা আর্থিক সমৃদ্ধির সমবণ্টন সম্ভব। আর দ্বিতীয়ত, বস্ত্র বা অনুরূপ কোনও প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনে প্রত্যেক মানুষ যদি দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা হ'লে আজ বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবীদের মধ্যে যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে তাও দূর হয়ে যাবে ব'লে তিনি মনে করতেন।

তা ছাড়া আর একটি কথা আছে। ধরুন, ভারতের মত বৃহৎ দেশে কবে সমগ্র দেশ বৈদ্যুতিক শক্তিতে প্লাবিত হবে তার আশায় আশায় কি মানুষকে উপস্থিত ধনতন্ত্রের দাসত্বে ব'সে থাকতে হবে?

পাঠক। তা কেন? ধনতন্ত্রকে দ্রুত ভেঙে কলকারখানা বা জমি ও নদনদী সবই রাষ্ট্র বা সর্বসাধারণের অধিকারে আনতে হবে।

লেখক। নিরস্ত্র শ্রমিকশ্রেণী বা ভারতের মত নিপীড়িত দেশের পল্লীবাসী চাষীকুল যদি ধনতন্ত্রের সঙ্গে অসহযোগ করে, তা হ'লে তারা কী খেয়ে-প'রে বাঁচবে ?

পাঠক। সেইজন্যই তো নিপীড়িতের পক্ষ নিয়ে, তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা রচিত সেনা-বিভাগে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দ্রুত কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

লেখক। কিন্তু আজকের যুদ্ধাস্ত্র যে ভাবে উন্নত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কামান-বন্দুক নিয়ে কি জনসমূহ দাঁড়াতে পারবে ? অহিংস অসহযোগ কি তাদের পক্ষে আরও বেশি সহজ ও সম্ভব নয় ?

পাঠক। কিন্তু অহিংস অসহযোগই যদি তারা করে, তখন ধনতন্ত্রের অঙ্গস্বরূপ জমির বা কলের মালিক তাদের তাড়িয়ে দিয়ে কি পরাস্ত করতে পারে না ?

লেখক। পারে। কিন্তু সত্যাগ্রহের প্রস্তুতির সময়ে তারা যদি চরকা-খদ্দরের কাজ শেখে, অন্যান্য শিল্প আয়ত্ত করে, এবং সেই সব কাজকে পুরান ভাবে না ক'রে, প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিকে কেন্দ্র ক'রে নিজেদের মধ্যে সমবায়মূলক ছোট ছোট সমাজ গ'ড়ে তোলে, তা হ'লে তাদের লড়াইয়ে যুঝবার শক্তি কি বৃদ্ধি পাবে না ?

পাঠক। ও-রকম সংগঠন সফল হ'লে লড়াইয়ের শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে, অসহযোগ আরও দীর্ঘদিন হয়তো চালানো সম্ভব। কিন্তু অতখানি সংগঠন পর্যন্ত ধনীকুল আপনাদের অগ্রসর হতে দেবে কি না তাতেই সন্দেহ আছে। আজ জগতের সর্বত্র ধনীশ্রেণী উৎপাদন-ব্যবস্থাকে যে ভাবে নিজেদের করায়ত্ত

ক'রে রেখেছে, এবং রাষ্ট্রশক্তির সুকৌশল ব্যবহারের দ্বারা শ্রমিক-শ্রেণীকে যে ভাবে পদানত ক'রে রেখেছে, গঠনকর্মের ভিতর দিয়ে নূতন মুক্তির প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়া তাদের পক্ষে কি সম্ভব নয়? ১৯৪২ সালের বিপ্লবের সময়ে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের চাপে সর্বত্র খাদি বা বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ কি বন্ধ হয়ে যায় নি?

লেখক। ধনীদের বাধা দেবার শক্তি যে প্রচণ্ড এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তি বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে, তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গড়ার কাজে আমরা যতই অগ্রসর হই না কেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি ধনীদের হাতে থেকে যায়, তা হ'লে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগের দ্বারা তারা গড়ার চেষ্টাকে পরাস্ত ক'রে দেবে, তাতেও সন্দেহ নেই। সেই জন্য গান্ধীজী মনে মনে নৈরাজ্যবাদী হয়েও রাষ্ট্রের ক্ষমতা অধিকার করার জন্য বারংবার সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতরাষ্ট্র নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা করবেন; আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে জনসমূহের মধ্যে বিকীর্ণ ক'রে দেওয়ার জন্য গান্ধী-প্রদর্শিত গঠনকর্মের কাজে সর্বতোভাবে উৎসাহ এবং সহায়তা দান করবেন।

পাঠক। তাই যদি হয়, তবে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব-সাধনের পূর্বে গড়ার কাজ তো নিরর্থক। আগে ধনীশ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তার পর তো গড়ার কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। আপনি যে ভাঙার আগেই গড়তে চান!

লেখক। গান্ধীজী ঠিক ভাঙার আগেই গড়ার কথা বলতেন না, গড়তে গড়তে ভাঙার কথা বলতেন। আগে ভাঙা, পরে গড়া—এ নীতি তিনি সমর্থন করতেন না।

পাক। কেন?

লেখক। তার কারণ, শুধু ভাঙার দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। ভবিষ্যতে কি ধরনের সমাজ আমরা রচনা করতে চাই, আজ থেকেই তার সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা জনসাধারণকে তিনি দেওয়ার চেষ্টা করতেন। ভবিষ্যতে সমতামূলক সহযোগিতাপূর্ণ যে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, সেই আদর্শের একটু নমুনা তিনি চরকা-খদ্দর অথবা বুনিয়াদী শিক্ষার মারফত এখন থেকে জনসাধারণের সামনে স্পষ্ট ক'রে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন।

শুধু রাষ্ট্রবিপ্লবের বিষয়ে, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হ'ত, তা হ'লে তাঁর নেতৃত্বে হয়তো জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একদিন অধিকার ক'রে বসত। কিন্তু তার পর কি গড়তে হবে, এই নিয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকার দরুণ জনসমূহ যার-তার হাতে গড়ার কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিত। তাতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের আশঙ্কাই বেশি। মানুষের ইতিহাসে বারংবার দেখা গেছে যে, রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে জনসাধারণের শোষণ এক রূপ পরিহার ক'রে অন্য রূপ নিয়েছে, শোষণমুক্তি সুদূর স্বপ্নের মতই থেকে গেছে।

তাই গান্ধীজী ভবিষ্যৎ সমাজের চারা এখন থেকেই বোনবার চেষ্টা করতেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আয়ত্তে

আসবে, তখন সর্বত্র সেই চারা ব্যাপকভাবে রুইবার সময় হবে ব'লে তিনি মনে করতেন। তার অভাবে নতুন জীবনের নমুনা বীজাকারেই হয়তো সমাজদেহের আনাচ-কানাচে থেকে যাবে, তার ব্যাপ্তি বা প্রসার সম্ভব হবে না।

পাঠক। আচ্ছা, তর্কের খাতিরেও যদি ধ'রে নিই যে জনসমূহ ভবিষ্যতের চারা এখন থেকে ছোট ছোট ক্ষেতে তৈরি ক'রে রাখতে পারে, এবং হয়তো বিপ্লবের পর নতুন জীবন গড়বার সময়ে এর দ্বারা সুবিধা হওয়া সম্ভব, তবু প্রশ্ন ওঠে, এইভাবে গড়া এবং ভাঙার কাজ একসঙ্গে মেশালে দুই চেষ্টাই কি দুর্বল হয়ে পড়ে না? তার চেয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে প্রথমে ভেঙে পরে গড়ার চেষ্টা করা কি ভাল নয়?

লেখক। আপনার যুক্তি মানলাম। কিন্তু আপনি যখন দ্রুত কার্যসিদ্ধির কথা ভাবেন, তখন হিংসার পথে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের কথাই তো ভাবছেন?

পাঠক। নিশ্চয়ই। রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত না হ'লে গড়ার কাজ যে পূর্ণ করা যায় না, আপনি গান্ধীবাদী হয়েও তা স্বীকার করেছেন। আমার মত হ'ল, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আপনারা যাকে হিংসা বলেন তা ভিন্ন অপর কোনও উপায়ে হস্তান্তরিত হতে পারে না।

লেখক। আচ্ছা, হিংসার পথে বিপ্লবকে নিয়ন্ত্রিত করতে হ'লে একটি পার্টির প্রয়োজন অপরিহার্য ব'লে আপনি মনে করেন তো?

পাঠক। নিশ্চয়ই। সেই পার্টি শুধু ভাঙার সময়ে নয়, গড়ার সময়েও জনসাধারণকে শিক্ষিত এবং নিয়ন্ত্রিত করবে।

লেখক। গান্ধীজীর বিপ্লবপন্থা এমন জিনিস যে সেখানে পার্টির প্রয়োজনীয়তা যথাসম্ভব কম। জনসমূহ যদি গোড়া থেকেই জানে, কি উদ্দেশ্যে তাদের বিপ্লব, এবং তারা যদি সত্যাগ্রহের কর্মকৌশলও আয়ত্ত ক'রে থাকে, তা হ'লে বিপ্লব বা শান্ত প্রতিরোধের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তিকে একেবারে অকেজো ক'রে ফেলা সম্ভব। হিংসার পথে পরিচালনকার্য কেন্দ্রীভূত না হ'লে দ্রুত সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। অহিংসার পথে গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল, বিপ্লব-প্রচেষ্টাকেও যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীভূত করা। কর্মারম্ভে প্রতি সত্যাগ্রহী লক্ষ্য এবং উপায় সম্বন্ধে স্থিরদৃষ্টি হয়ে নেবে, কিন্তু কার্যকলাপে প্রত্যেকে নিজের অবস্থা অনুসারে অগ্রসর হবে। যুদ্ধে প্যারাট্রুপ সৈনিক যেমন ভাবে চলে, সত্যাগ্রহীকে তেমনই নিজের নেতৃত্ব নিজের উপরেই রাখতে হয়। অন্তত সত্যাগ্রহ-পদ্ধতির লক্ষ্য হ'ল তাই।

পাঠক। সন্দেহ হয় মশাই। যে জনসাধারণ এতদিনের শোষণে জর্জর হয়ে আছে, যাদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যারা সংঘবদ্ধ নয়, বিক্ষিপ্তভাবে থাকে, তারা কখনও শুধু অহিংসার একটি মন্ত্রকে আশ্রয় ক'রে সমবেত চেষ্টা দ্বারা বিপ্লবকে সার্থক করতে পারে? হয়তো তারা খানিকটা গোলমালের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তিকে ধনীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, কোনও বুদ্ধিযুক্ত সুকৌশলী পার্টির সাহায্য ব্যতিরেকে কি করে সম্ভব হবে? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না।

লেখক। আপনার সন্দেহ যে সঙ্গত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু হিংসাত্মক বিপ্লবের পরে কোনও পার্টি নিজের হাত থেকে

ক্ষমতার রাশ স্বেচ্ছায় অপরের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, তার কোনও নজির দিতে পারেন ?

পাঠক। তাতে কি হ'ল ? আগে হয় নি ব'লে আজ সে রকম পার্টি হতে পারে না—এ কথা আপনাকে কে বললে ? আগে মানুষ আকাশে উড়তে পারত না, আজ বিজ্ঞানবলে তাও সম্ভব হয়েছে।

লেখক। ঠিক কথা। পূর্বকালে অহিংস বিপ্লব সম্ভব হয় নি ব'লে আজকেও তা সম্ভব হবে না, আপনিই বা তা ভাবছেন কেন ?

পাঠক। ইতিহাসে অহিংসা কোথাও সফল হয়েছে দেখাতে পারেন ?

লেখক। পারি। পূর্বে যেখানে হিংসার ব্যবহার অপরিহার্য ব'লে মনে করা হ'ত, সেখানে আজ মানুষ অহিংসার প্রয়োগ ক'রে থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরাই ছেলেবেলা কত মার খেয়েছি! পাগলের চিকিৎসা বা অপরাধীর সংশোধনের জন্য প্রহার বা শাস্তি ভিন্ন অন্য পথ মানুষের জানা ছিল না। কিন্তু আজ শিক্ষাবিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্বের এতদূর উন্নতি হয়েছে যে, হিংসার ব্যবহার উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্র থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শিক্ষার ব্যাপারে এবং মানসিক রোগের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘ'টে গেছে।

এক কথায়, ব্যষ্টির পরিবর্তনসাধনে পূর্বে যেখানে হিংসার প্রয়োগ ছিল, সেখানে আজ মানুষ অহিংসাকে একমাত্র কার্যকরী পন্থা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। সমাজের বেলায় মানুষ আজও

সংরক্ষণশীল হয়ে রয়েছে। বহুজনকে পরিবর্তন করবার চেষ্টায় মানুষ অহিংসা প্রয়োগ করতে ভরসা পায় না, চিরাচরিত হিংসার প্রয়োগের উপরেই নির্ভর করে।

পাঠক। আপনি কি বলতে চান, স্বার্থান্বেষী ধনীকুল অহিংসার প্রভাবে এমনই বদলে যাবে যে দরিদ্রের জন্য তাদের প্রাণ কেঁদে উঠবে ?

লেখক। না, তা নয়। অহিংস সত্যাগ্রহের দ্বারা তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন হ'লে তখন তারা দরিদ্র জনসাধারণের যুক্তি শুনবে এবং দরিদ্রগণ যে নূতন সমাজব্যবস্থা রচনা করতে চায়, সে বিষয়ে সাহায্য বা সহযোগিতাও হয়ত করতে পারে।

পাঠক। অসম্ভব কথা। হৃদয়ের পরিবর্তন ওদের হবে, আপনার এই ধারণা অলীক স্বপ্ন।

লেখক। আচ্ছা, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি। যখন আপনি হিংসাত্মক বিপ্লবের কথা বলেন, তখন কি আপনি ভাবেন না যে ধনমানমত্ত স্বার্থান্বেষী ধনীশ্রেণীকে প্রহারের দ্বারা আপনি পদানত করবেন, দর্পচূর্ণ করবেন ?

পাঠক। হ্যাঁ, তা তো করিই। কিন্তু সেটা তো হৃদয়ের পরিবর্তন নয়।

লেখক। এক দিক থেকে হৃদয়ের পরিবর্তন বই কি। যে হৃদয় দম্ভে ও শক্তির অহঙ্কারে' আচ্ছন্ন ছিল, সেখানে ভয় এসে উপস্থিত হ'ল। ভয়ের বশে ধনীকুল আপনার কথা শুনতে রাজী হ'ল, যুক্তিতে সায় দিয়ে গেল। অহিংসার পথে ভয়ের

পরিবর্তে দরিদ্র সত্যাগ্রহীগণ নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব জাগাবার চেষ্টা করেন মাত্র।

দরিদ্রেরা যদি বলে, আমরা শোষণমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে অসহযোগ করব, তোমার যত সাজা দেবার ক্ষমতা আছে দাও, আমাদের ভাঙতে পারবে না। আমরা গঠনকর্মের দ্বারা যতটুকু খাওয়াপরার ব্যবস্থা করেছি, তার আশ্রয়ে বরং গরিবের মত বেঁচে থাকব তবু আমাদের দ্বারা তুমি আর নিজের শোষণব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না, তা হ'লে অবস্থা কি দাঁড়ায়?

পাঠক। কি আর দাঁড়াবে? ধনীরা গরিবদের অসম্ভব প্রহার দিতে আরম্ভ করবে। অনাহারের দ্বারা তাদের সায়েস্তা করার চেষ্টা করবে।

লেখক। যদি সত্যাগ্রহী অটল থাকে, নিজেরা মরে তবু বশ্যতা স্বীকার না করে, তা হ'লে ধনীকুল শেষ পর্যন্ত নিজেদের কলকারখানা ও জমিদারি চালাতে পারবে না। উপরন্ত দরিদ্রদের সাহসে তাদের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা হয়ত জাগতেও পারে।

দরিদ্রেরা হিংসা প্রয়োগ করলে ধনীকুল আত্মরক্ষার খাতিরে নিজেদের অস্ত্রপ্রয়োগকে যে ভাবে ন্যায্য বা সঙ্গত ব'লে মনে করত, অহিংসার বিরুদ্ধে অস্ত্রপ্রয়োগের বেলায় বেশিদিন সে সুবিধা ভোগ করতে পারবে না, অন্তরে একটু লজ্জা পাবেই পাবে।

পাঠক। বলিহারি যাই! তারা গরিবদের নির্মূল না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে ব'লে আপনি মনে করছেন? তারা লজ্জা

পাবার লোকই নয়। তাদের চোখের পর্দা নেই। যতদিন স্বার্থবুদ্ধি প্রবল থাকবে, ততদিন তাদের দৃষ্টিও বদলাবে না।

লেখক। বদলাবে, এই ভরসা নিয়েই সত্যাগ্রহী অগ্রসর হন।

পাঠক। আচ্ছা, সত্যিই আপনি মনে করেন সত্যাগ্রহের তাড়নায় ধনীদের মধ্যে কোনদিন শুভবুদ্ধির উদয় হবে?

লেখক। প্রত্যেক ধনীর হৃদয় পরিবর্তিত হয়ে যাবে, এমন আশা সত্যই আমি যে করি, তা বলতে পারি না। কিন্তু দুষ্টপ্রকৃতির ধনীরা শেষ পর্যন্ত একা প'ড়ে যাবে, অর্থাৎ কোণঠাসা হবে ব'লে আমি মনে করি। একটি উদাহরণ দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করব।

পাঠক। বলুন।

লেখক। বাঙলা দেশে ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধেছিল, আপনার মনে আছে তো? তার মধ্যে নোয়াখালিতেও দাঙ্গা হয়। সেই দাঙ্গায় মুসলমান জনতা প্রায় তিন শ' লোককে খুন করে, কয়েক কোটি টাকার ঘরদোর পুড়িয়ে দেয় বা লুঠ করে, নারীদের উপরেও অনেক রকমের অত্যাচার করে এবং যে-হিন্দুরা পালাতে পারে নি তাদের ধর্মান্তরিত করে।

সে সময়ে গুণ্ডার রাজত্ব চলেছিল। সাধারণ মুসলমান জনতাকে উত্তেজিত ক'রে কিছু মতলববাজ বুদ্ধিমান মুসলমান এই সব অঘটন ঘটিয়েছিল।

গান্ধীজী সেখানে পৌঁছে সাধারণ মুসলমানকে সেবা এবং সৎশিক্ষাদানের দ্বারা প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দুকেও তিনি বলেছিলেন, ভয়ের বশে কেউ যেন ধর্মান্তরিত

না হয়, নোয়াখালিতেই নিজের ধর্মানুষ্ঠান বজায় রেখে, সাহসের সঙ্গে বেঁচে থাকতে হবে। তিনি তাদের এ কথাও বলেছিলেন যে, যদি তারা এই সন্ধিক্ষণে নিজেদের জীবনকে বদলে ফেলতে পারে, ডাক্তার যদি সেবার মনোভাব নিয়ে গ্রামের সর্ব-সাধারণকে সুস্থ হতে শেখান, ইঞ্জিনিয়ার তাদের সহজে অল্প-ব্যয়ে আদর্শ গৃহ নির্মাণ করতে শেখান, তবে সেই সেবার বশে সাধারণ মুসলমান ক্রমশ মনে করবে, এই সব শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রামে থাকার ফলে আমাদের জীবনের উন্নতি ঘটছে। সেই রকম লোক যদি স্বীয় হিন্দুধর্মে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকতে চায়, মুসলমানেরা হয়ত আপত্তি করবে না। যদি কুশিক্ষার বশে, সাময়িক উত্তেজনার ফলে আপত্তি ক'রে বসে, তখনও যদি হিন্দুরা অবিচল সাহসের সঙ্গে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না ক'রে শুধু নিজেদের মরণের সঙ্কল্পের দ্বারা ধর্মে অবিচল থাকে, তা হ'লে এক নূতন ফললাভের সম্ভাবনা দেখা যায়।

মুসলমানদের মধ্যেও সকলে অসৎ নয়, একটি সমাজে সকলে এক কালে সৎ বা অসৎ হতে পারে না। তবে সৎ সচরাচর দুর্বল হয় এবং অসৎ সহজে প্রবল আকার ধারণ করে। অধিকাংশ মানুষই সৎ ও অসতের সংমিশ্রণে তৈরি। সাময়িক উত্তেজনার বশে তাদের চিত্তেও সৎ স্তিমিত হয়ে যায়, অসৎ প্রাবল্য লাভ করে। এই অবস্থায় সত্যাগ্রহীদের অহিংস প্রতিরোধের ফলে সৎ আর স্তিমিত অবস্থায় প'ড়ে থাকতে পারে না। মুসলিম সমাজের মধ্যেও যারা সৎ আছে, তারা জাগ্রত হয়ে অসৎকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে।

দাঙ্গার সময়ে যে অশুভ শক্তি প্রাবল্য লাভ করেছিল, সাধারণ মুসলমানের অন্তরস্থ সৎ এবং অসতের মধ্যে অসৎকে লোভ বা ক্রোধের উস্কানিতে প্রবল ক'রে যারা হিন্দুর অনিষ্টসাধন করেছিল, সত্যাগ্রহের ফলে সতের যখন শক্তিবৃদ্ধি হবে, তারা তখন সাধারণ মুসলমানের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ ক্রূর স্বার্থান্বেষী গুণ্ডাদের হৃদয় সদ্য সদ্য পরিবর্তিত না হ'লেও, যে বলের সুযোগ নিয়ে তারা ব্যাপকভাবে কার্যসিদ্ধি করে, সেটা আর সম্ভব হবে না ; তারা কোণঠাসা হয়ে যাবে। মোটের উপর সত্যাগ্রহীদের বীর্যের প্রভাবে সতের ব্যাপ্তি এবং অসতের সঙ্কোচ সাধন হবে। ফলত সত্যাগ্রহী সফলকাম হবেন।

পাঠক। তর্কের খাতিরে আপনার মতের যৌক্তিকতা স্বীকার হয়ত করতে পারি। কিন্তু কোথাও এ রকম ঘটেছে বলতে পারেন ? নোয়াখালিতে গান্ধীজীর চারমাসব্যাপী চেষ্টায় কি আশানুরূপ ফললাভ হয়েছিল ?

লেখক। না, নোয়াখালিতে গান্ধীজী আশানুরূপ ফললাভ করতে পারেন নি এ কথা সত্য। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘ দিনের পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক অসহযোগ অথবা দ্বন্দ্ব চার মাসের চিকিৎসাতেই মাত্র দু-চারজন লোকের চেষ্টায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এ কথা আশা করাই অন্যায়।

কিন্তু অহিংসার ফল যে হয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পাঠক। বলেন কি ? ১৯৪২-এর আন্দোলনকে আপনি অহিংসার সাফল্য বলতে চান না কি ?

লেখক। ১৯৪২-এ আমাদের মন ইংরেজের প্রতি প্রেমে পূর্ণ ছিল না, এ কথা সত্য। কিন্তু ইংরেজকে আমরা খুনও তো করি নি। গান্ধীজী সংগ্রামকে অহিংস রাখতে চান, এ কথা জেনে লোকে থানা দখল করেছে বটে, কিন্তু পুলিসের পরিত্যক্ত অস্ত্র ব্যবহার না ক'রে পুকুরে ফেলে দিয়েছে বা ভেঙে ফেলেছে। মোটের উপরে, আচরণে তারা সংযত ছিল। দু-এক জায়গায় অসম্ভব অত্যাচারী রাজকর্মচারীর প্রতি ব্যক্তিগত ক্রোধ বা প্রতিহিংসা বশে তাদের খুনও করা হয়েছে। কিন্তু ইংরেজকে জাতি হিসাবে বিপন্ন করা হয় নি।

১৯২১, ১৯৩১-৩৩, ১৯৪১-এর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এবং ব্যক্তিগত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়ে আমাদের নেতা গান্ধীজী বারংবার ইংরেজকে এই আশ্বাস দিয়ে এসেছিলেন যে, আমরা স্বাধীনতাকে ভালবাসি ব'লেই মরণকে আহ্বান করছি। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করা আমাদের লক্ষ্য, ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজের প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ নাই। ফলে ১৯৪৫-এর পর যখন আন্তর্জাতিক অবস্থা এমন হ'ল যে, ইংরেজকে ভারতবর্ষ ছাড়তেই হবে, তখন ইংলণ্ডের মধ্যে এক বৃহৎ দলকে পাওয়া গেল যারা ভারতের স্বাধীনতার দাবিকেও সমর্থন করেছিল। বিশ-পঁচিশ বছরের মোটামুটি অহিংস আচরণের ফলে ইংলণ্ডেও আমরা ভারতের দাবির সমর্থক একটি দল সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম। হিংসার অস্ত্র ধারণ করলে ইংলণ্ডের অভ্যন্তরে ভারতের দাবির সমর্থক অত বড় দল পাওয়া যেত না।

পাঠক। ভারতের বহু লোক যে ব'লে থাকেন, আই এন এ.-সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলেই ইংরেজ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এটা কি আপনি স্বীকার করেন না?

লেখক। আই. এন.এ-র কোনও ফল হয় নি, আমি এমন কথা বলি না। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত যুদ্ধ চালানোর পর যখন সন্ধি হ'ল, তখন ইংরেজ সৈনিকেরা রণক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বাড়ি ফেরবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। ভারতের সেনাবিভাগেও আই. এন. এ.-র ইতিহাস শুনে বিদ্রোহের মনোভাব ধূমায়িত হচ্ছিল। ইংরেজ হয়ত ভাবলেন, এ অবস্থায় সাম্রাজ্যরক্ষা আর ভারতীয় সৈনিকের দ্বারা সম্ভব হবে না বা অত্যন্ত অনিশ্চিত হবে। ক্লান্ত ইংরেজ সৈনিকের মধ্যেও সাম্রাজ্য রক্ষার আগ্রহ বেশি থাকবে না। সর্বোপরি ১৯৪২ সালে দারুণ বিরোধিতার সম্ভাবনা সত্ত্বেও, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সর্ববিধ চেষ্টাকে পরাস্ত ক'রে, ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং রুশিয়ার সমর্থন ব্যতিরেকে পরাজয় অতিসম্ভব জেনেও যখন কংগ্রেস আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তখন ১৯৪৫-এর রণক্লান্ত পৃথিবীতে সেই প্রতিষ্ঠান যদি ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না—এই সব ভেবে-চিন্তেই হয়ত ইংরেজ মানে মানে বিদায় নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করেছিলেন।

পাঠক। তা হ'লে ভারতের মুক্তি শুধু অহিংস-অসহযোগের শক্তিতে ঘটে নি—এ কথা আপনিও স্বীকার করছেন!

লেখক। তাতে সন্দেহ কি! পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই কোন জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তখন সে কেবল নিজের

হিংসাস্ত্রের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করেছে, এমন কথা মনে করার কারণ নাই। বহু ঘটনার সংমিশ্রণে রাষ্ট্রক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়। ভারতের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এবং সেই সকল ঘটনা পরম্পরার মধ্যে অহিংস সংগ্রামশক্তি ১৯২১ থেকে পঁচিশ বৎসর ধ'রে এক দিকে যেমন ভারতের জনগণকে শক্তিশালী করেছিল, অপর দিকে তেমনই ইংরেজ জাতির হৃদয়ের মধ্যে সৎভাবের উন্মেষ এবং পরিপোষণ করেছিল, তাও তো বড় কম কথা নয়। তার দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা লাভ যে আরও সহজ হয়েছিল, এ কথা কি আপনি অস্বীকার করবেন?

পাঠক। তা হ'লে আপনি কি বলতে চান, মানুষের মধ্যে ভাল বুদ্ধিকে জাগ্রত ক'রেই আমরা সর্বদা বিপ্লবসাধনের চেষ্টা করব?

লেখক। আপনি যথার্থ বলেছেন। মঙ্গলের পথকে আশ্রয় ক'রেই বিপ্লবসাধন করা উচিত ব'লে আমরা মনে করি।

পাঠক। দ্রুত কার্যসিদ্ধির জন্যে মানুষের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে, তাকে কাজে লাগানোয় ক্ষতি কি? কাঁটা দিয়েই যদি তাড়াতাড়ি কাঁটা তোলা যায়, তা হ'লে অন্য চেষ্টার দরকার কি? আমাদের কাঁটা তোলাই যদি লক্ষ্য হয়, তা হ'লে যাতে কাঁটা তাড়াতাড়ি তোলা যায় সেই তো ভাল পথ।

লেখক। আমরা তা মনে করি না। ধনীশ্রেণী লোভ, অহঙ্কার ও শক্তির মত্ততায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করেছে, তাকে ভাঙবার জন্য আপনারা অত্যাচারিত মানুষের অন্তরে ক্রোধ প্রতিহিংসা প্রভৃতির ভাবকে জাগিয়ে বাতাস দিয়ে

সেই আগুনকে আরও বাড়িয়ে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে ভস্মীভূত করতে চান। কিন্তু কার্যসিদ্ধির তাগিদে মানুষের অন্তরের রাক্ষসী প্রবৃত্তিগুলি যখন পুষ্টিলাভ করে, ভবিষ্যতের সমাজগঠন সময়ে তারাই আবার নানা নতুন অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। সেই সম্ভাবনা থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই। সেই জন্য শুভ আদর্শে পৌঁছানর উদ্দেশ্যে আমরা শুভ উপায়ের সন্ধান ক'রে থাকি।

পাঠক। কিন্তু শুভ উপায়ের দ্বারা শুভ ফললাভের ইতিহাস রাজনীতিক্ষেত্রে নাই বললেই চলে। তবু আপনারা অন্য প্রমাণিত পথ পরিহার ক'রে চলবেন?

লেখক। হিংসার যে পথকে আপনি আপাতত সার্থক ব'লে মনে করছেন, সূক্ষ্ম বিচারে তার মধ্যে আমরা এত গ্লানি দেখতে পাই যে নূতন পরীক্ষা করতে আমরা পশ্চাৎপদ হই না।

গান্ধীজীর বিশেষত্ব এই যে, তিনি সমষ্টির ক্ষেত্রে বৃহৎ রাজনৈতিক বিপ্লব সাধনের জন্য জগতের বৃহত্তম পরীক্ষা করেছিলেন। মানুষের সমষ্টিগত জীবনের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্যার বেলায় অহিংসার নূতন নূতন পথ বা প্রয়োগকৌশল হয়ত আবিষ্কার করতে হবে। তাতে সময় লাগবে, মানুষকে অনেক নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে হবে। অহিংসা শুভদায়ক ব'লে, মানুষের চিত্তের উন্নতিবিধান এবং শুভের উদয় এই পথে দ্রুত সম্ভব ব'লে সত্যাগ্রহকেই গান্ধীজী শ্রেষ্ঠতম পথ বলতেন।

পাঠক। যদি ধ'রেই নিই যে অহিংসায় সাফল্য লাভ হয়, তবু কি এ পথকে আপনারা অনাবশ্যক রকম দীর্ঘ ব'লে মনে করেন না?

লেখক। আপাতত দীর্ঘ ব'লে মনে হতে পারে, কিন্তু পথের ফল নিশ্চিত লাভ হয় ব'লে অনিশ্চয়াক্রান্ত হিংসার পথ অপেক্ষা সত্যই অহিংসা দ্রুত সিদ্ধিদান করে। স্বরাজ লাভের পথে গড়ার কাজ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে চলে ব'লে 'আগে ভাঙা পরে গড়া'র পথের চেয়ে 'গড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা'র পথ ভাল। দুর্বলচিত্ত মানুষের পক্ষে হিংসা প্রিয়তর বা আপাতত স্বাভাবিক ব'লে মনে হলেও শ্রেয় নয়। শ্রেয়কে আশ্রয় করলে মঙ্গললাভ নিশ্চয়ই ঘটবে।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

সত্যাগ্রহের মূল কথা

ভারতীয় সাধনার অন্তর্নিহিত ধারা

শতদ্রু নদী যেখানে হিমালয় পর্বত ভেদ করিয়া পঞ্জাবের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, সেইখান দিয়া তিব্বত এবং মানস-সরোবরে যাইবার একটি দুর্গম পথ আছে। আমার জনৈক ইংরেজ শিক্ষক এক সময়ে এই উপত্যকায় পাথর এবং পর্বতের প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে যান। সেখানে তাঁহার সঙ্গে এক সাধুর সাক্ষাৎ হয়। সাধু দরিদ্র, জীর্ণ পোশাক পরিয়া পূর্ব অভিমুখে চলিয়াছেন। পায়ে জুতা নাই, হিমের তাড়নায় পা ফাটিয়া ঘা হইয়া গিয়াছে, সেই ঘায়ের উপরে তিনি কয়েক প্রস্থ কাপড় জড়াইয়া অতি ধীরে ক্লান্তপদক্ষেপে আগাইয়া চলিয়াছেন। আমার শিক্ষক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তিনি

মানসসরোবর পর্যন্ত যাইবেন। তিনি তখন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এত কষ্ট করিয়া, সুব্যবস্থা না করিয়া, তীর্থে বাহির হইয়াছেন কেন? সাধু উত্তর দিয়াছিলেন, এই পবিত্র ভূমি দিয়া আমি চলিয়াছি, হয়তো কোনও দিন মানসসরোবরে পেঁ ৗছাইতে পারিব না সত্য, হয়তো পথ চলিতে চলিতে আমার দেহের অবসান ঘটিবে, কিন্তু আমি যে পর্যন্ত পেঁ ৗছাইব, সেই তো আমার মানস-তীর্থ।

বিচিত্র এই ভারতবর্ষ, বিচিত্র এখানকার মানুষ! ভারতীয় সাধনার পিছনে যে দুর্দমনীয় বলিষ্ঠ শক্তি চিরদিন তাহাকে প্রাণ দিয়া আসিয়াছে, যে বস্তু আজ সর্ববিধ গ্লানি এবং অকল্যাণের নিষ্পেষণেও মরে নাই, এ সেই পদার্থ। আমার এক বন্ধুর প্রপিতামহ কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত চৈতন্যদেবের হাঁটা সমস্ত তীর্থপথটি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

পাগল সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহারা হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে অথবা নঙ্গাপর্বতের শীর্ষে শুধু ক্ষণিকের জন্য আরোহণ করার উন্মাদনায় হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতে ইতস্ততঃ করে না, ইহা তাহাদেরই মত পাগলামি। যে পাগলামির বশে বৈজ্ঞানিক আগ্নেয়গিরির গহ্বরে যন্ত্রপাতি সমেত প্রবেশ করিয়া বাষ্প সংগ্রহ করেন, অথবা দারুণ বিষ নিজের, এমন কি পুত্রের শরীরে প্রবেশ করাইয়া চিকিৎসাবিদ্যায় গবেষণা করেন, এ সেই ধরণের বাতুলতা। এই বাতুলতা পিছনে রহিয়াছে বলিয়াই ইউরোপের পর্বতপ্রমাণ লোভ, স্বার্থপরতা এবং নিষ্ঠুরতার জঞ্জাল সত্ত্বেও সে বড়। ইউরোপীয় সাধনার পিছনে যে বীর্য অবিচলভাবে

বর্তমান, সে বস্তু হয়তো স্বার্থান্বেষী বণিকের নিষ্ঠুর বাণিজ্যপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় সত্য, অন্ধ সৈনিকের মৃত্যুভয় উপেক্ষা করা সংগ্রামের ভিতর দিয়া, সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য আত্মদানের আগ্রহে প্রকাশ পাইয়া সমগ্র জগৎবাসীকে উদ্‌বেজিত করে সত্য, তবু ইউরোপের মধ্যেই তাহার সাত্ত্বিক প্রকাশও আছে, তাই আজ ইউরোপ বড়। হয়তো লোভের তমসাস্তূপের ভারে সেই অমূল্য বস্তু নষ্ট হওয়ার মত হইয়াছে। তবু সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত সেই সম্পদকে উদ্ধার করিতে হইবে, তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। কেন না, সে সম্পদ তো শুধু ইউরোপের নয়, সমগ্র মানবজাতির সম্পদ।

ভারতবর্ষের জীবনধারার অন্তরালে যে শক্তিটি আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহাকেও তেমনই সমগ্র মানবজাতির কল্যাণপ্রয়োজনে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাকে বিপথগমনের ব্যর্থতা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ধারাটি ভারতের শিক্ষিত জনসমাজের জীবনের মধ্যে কদাচিৎ প্রকাশ পায়, সেখানে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার কারণও আছে। ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজ নিজের বলে বলীয়ান হইয়া, অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিকার হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া বড় হইয়াছিল। সেখানকার দরিদ্র জনসাধারণ আজও মুক্তিলাভ করে নাই সত্য, কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষমতা প্রচুর। অভিজাত সম্প্রদায়ের পরাজয়ের পর তাহাদেরই মধ্য হইতে মানুষ ধনী হইয়াছে, শক্তিমান হইয়াছে, জগতে ইউরোপের সাম্রাজ্যকে বিস্তারিত করিয়াছে। স্বীয় শক্তির উপরে তাহাদের

অধিষ্ঠান। কিন্তু ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইংরেজ বণিকের প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরেজী বাণিজ্য রক্ষার জন্য যে রাজতন্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে মজুরি করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ আমাদের সমাজে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নূতন ভাবে দেখা দিল। অভিজাত সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া যাহারা দরিদ্র হইল, দরিদ্র শিল্পীকুলের মধ্যে যাহারা ঘটনাচক্রে শিক্ষার সুযোগ লাভ করিল, তাহারা সকলে মিলিয়া আমাদের দেশে নূতন মধ্যবিত্ত সমাজ রচনা করিয়াছে। নিজের বীর্যের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নয়, পরগাছার মত বিদেশী বণিক, বিদেশী রাজতন্ত্রের প্রয়োজনে তাহারা জীবন লাভ করিয়াছে। এবং অল্পবীর্য বলিয়াই মধ্যবিত্তের এই জীবন শুধু দূর হইতে ইউরোপীয় সভ্যতার সমৃদ্ধিকে তারিফ করিয়াছে, তাহার ক্ষীণ ও অতিজীর্ণ অনুকরণ করিয়াছে, ইঙ্গ-বঙ্গ এক বিচিত্র সভ্যতা রচনা করার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। এই জন্যই আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে তপস্যার ভাব নাই, চাকরি বজায় রাখার বা বিদেশী বৈজ্ঞানিকের কাছে প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টাই তাহার মধ্যে ষোল আনা ফুটিয়া উঠে।

ইউরোপে বিজ্ঞান নিয়োজিত হয় জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য। জনসাধারণের বুদ্ধিকে, তাহাদের চিন্তাকে, তাহাদের ব্যবহার আচরণ এবং জীবনযাত্রাকে সমুন্নত করার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ কতই না চেষ্টা করেন। কিন্তু ভারতের বৈজ্ঞানিক-সমাজ পরগাছার মত, বিদেশী ধনতন্ত্রের আশ্রয়ভোজী। কোটি

কোটি দরিদ্র জনসমূহের জীবনের সঙ্গে তাহার অধ্যাত্মযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এখানকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুধু বাহারিয়া আলোকলতার মত রূপ লয়, মানুষের জীবনকে সিঞ্চিত সমৃদ্ধ করিতে পারে না। মধ্যবিত্তকুলের শোভাস্বরূপ চাকরিজীবী বৈজ্ঞানিকের তো এখানে সামাজিক দায়িত্বের বোধই নাই, তাই তাহার গবেষণার মধ্যে তপস্যার প্রয়োজনও হয় না।

অথচ তপস্যার এই শক্তি ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব হইতে মুক্ত, এবং শহরের দারিদ্র্য যে-সকল মানুষের মনকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই, এমন ভারতবাসীর প্রাণে আজও বর্তমান রহিয়াছে। আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি, এবং দেখিয়া ধন্য হইয়াছি বলিয়া মনে করি। ভারতের অরণ্যে প্রান্তরে ইহারই সন্ধানে বারংবার ঘুরিয়াছি। কাশীর জীর্ণ এক গলির মধ্যে একজন লোক তবলা বাজানো শিখিতেছে। শীতের দিন, কাঁচা মাটির ঘর, মেঝেও কাঁচা। তাহার উপরে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গুরুর নির্দেশমত ঘণ্টার পর ঘণ্টা তবলা বাজাইয়া চলিয়াছে। মাটির মধ্যে হাঁটু চাপিয়া ঈষৎ বসিয়া গিয়াছে, হাতের আঙুল ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, তাহাতে মোম ঘষিয়া নরম করিতেছে, তবু অভ্যাসের বিরাম নাই। এমন দৃঢ়তা দেখিয়া মাথা আপনিই নুইয়া আসে।

উড়িষ্যার সুদূর পল্লীর মধ্যে সাধকশ্রেণীর জনৈক পাথরের কারিগরের সন্ধান পাইয়াছিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, কোনদিন তো আপনার সাধনার দ্বারা সমাজ সার্থক হইবে না, সমাজ তো আপনাকে উপেক্ষা করে, তবু কিসের জোরে এ পথ

ধরিয়া রহিয়াছেন ? তিনি উত্তরে বলেন, আজ আদর নাই সত্য, কিন্তু কোন না কোন দিন আমার বংশধরেরা পুনরায় আদর পাইবে। সেই দিনের অপেক্ষায় শিল্পের ধারাটিকে বীজের মত বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, আমি সাধনা ছাড়িয়া দিলে যে বীজই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ! উড়িষ্যার এক গ্রাম্য কবির সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, তিনি সমাজসংস্কারের চেষ্টায় একঘরে অবস্থায় অষ্টাদশ বর্ষকাল যাপন করিয়াছিলেন, তবু সংস্কারের চেষ্টা ছাড়েন নাই। অথচ নিজের কাব্যসাধনাও ক্রোধের বশে, অবহেলার পীড়নে নষ্ট হইতে দেন নাই, মনের মাধুর্য বিন্দুমাত্র তাঁহার ক্ষয় হয় নাই। এই সকল সাধকই ভারতের অন্তর্নিহিত বস্তুটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

গরিব অশিক্ষিত জনসমূহের জীবনেও ইহার প্রকাশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দরিদ্র তীর্থযাত্রী দিনের পর দিন হাঁটিয়া পার্বত্যপথে দেব-দর্শনের জন্য যাত্রা করে। কোথায় গঙ্গোত্রী হইতে আনীত এক বিন্দু জল মহাদেবের মাথায় অর্পণ করিবার চেষ্টা করে। বদরীকেদারের মন্দিরে যে পতাকা ওড়ে, তাহারই ছিন্ন এক অংশ সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনে যমুনার পাশে এক ক্ষুদ্র মন্দিরে অর্পণ করিয়া আসে—শুধু এইটুকু সাক্ষ্য দিবার জন্য যে সে দেবতার উদ্দেশ্যে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া সাধ্যমত সামান্য উপহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

পরকালে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য, অথবা শুধু ভ্রমণের নেশায়, পুণ্য-সংগ্রহকে উপলক্ষ্য করিয়া, আজও সহস্র সহস্র ভারতবাসী তীর্থযাত্রার কষ্টকে আনন্দে বরণ করিয়া লয়। তাহারাই দেবতার

মন্দিরে পয়সা চড়ায়, গঙ্গার ঘাটে যেখানে রামায়ণ-মহাভারতের পাঠ হয়, সেখানে স্নানান্তে ফিরিবার সময়ে এক মুঠা চাল দিয়া প্রণাম করে, কোথাও সমবেত জনতা পথ দিয়া যাইতেছে দেখিলে জোড়হাতে 'হরিবোল' উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করে, রোগজীর্ণ শিশুকে বাঁচানোর জন্য অনাহারে নিজের জীবন উৎসর্গের উদ্দেশ্যে দেবস্থানে হত্যা দেয়, ইহারাই ভারতবর্ষ, ইহাদেরই মধ্যে ভারতের শ্রেষ্ঠতম যুগে লব্ধ মানসশক্তি—সাত্ত্বিক বীর্য—আজও ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় হারামণির মত বাঁচিয়া আছে। হয়তো আজকার দুর্দিনে সেই শক্তির তামসিক প্রকাশই বেশি, বহু কুসংস্কার তাহার প্রভাবে বাঁচিয়া রহিয়াছে; কিন্তু তবু সেই অন্ধবিশ্বাসের পিছনে জীবনের যে-শক্তি ক্রিয়া করিতেছে সে বস্তু সত্য, তাহার আজও মরণ ঘটে নাই। কখনও কখনও একআধজনের জীবনে তাহার সাত্ত্বিক বিকাশও দেখা যায়। উড়িষ্যার কবি বা শিল্পী, হিমালয়ের সাধুর জীবনে তাহার অমৃতরূপ ফুটিয়া উঠে সত্য, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এত অল্প, ভারতের জীবনে তমোরাশির পরিমাণ আজ এত বেশি যে, ঐ শান্ত শক্তিকে যদি বিকীর্ণ করা না যায়, আমাদের মানুষ হইয়া জগতে বাঁচিয়া থাকার কোন সার্থকতা থাকিবে না। কিন্তু ভারতের অন্তর্নিহিত সাধনার ধারা আজও যে বাঁচিয়া আছে, এইটিই আমাদের সকলের চেয়ে বড় ভরসার কথা।

সার্থক মরণের উপায়

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসীর মধ্যে কি প্রভেদ জান? গৃহস্থ জীবনকে আঁকড়ে থাকে, কি ক'রে বাঁচবে

তারই চিন্তা করে, আর সন্ন্যাসী মরণকে আলিঙ্গন করতে চায়। মরবে ত সকলেই। কিন্তু মানুষ নিজের জীবনটুকু কত সার্থক-ভাবে আহুতি দিতে পারে সন্ন্যাসী সেই বিষয়ে চিন্তা করেন। সেই আহুতির দ্বারাই তিনি মরণের অতীত অমৃতপদ লাভ করেন।

গান্ধীজী স্বামী বিবেকানন্দের সহিত একই পথের পথিক। সত্যাগ্রহ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, ইহার মূলমন্ত্র হইল, মৃত্যুকে স্বীকার করা, মৃত্যুকে বরণ করা। এবং জীবনের এই উৎসর্গ পরলোকে কোনও পদলাভের জন্য নয়, পুণ্যের বেসাতি খরিদ করিবার জন্য নয়, জগতের নিপীড়িত জনগণ দুঃখের ভার হইতে কি করিয়া মুক্তিলাভ করিবে, তাহারই পথ অনুসন্ধানের জন্য। স্বামীজী বলিতেন, যদি মানুষের দুঃখনিবৃত্তির জন্য আমাকে কোটি জন্ম সংসারের ক্লেদের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হয়, আমি তাই আসিব। সকল বোধিসত্ত্বগণের ঐ একই বাণী। সে বাণী ভারতের সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে আজও ক্ষীণধারায় বর্তমান। স্বামী বিবেকানন্দ অথবা গান্ধীজী তাহাকে আত্মিক পুণ্যের লোভ হইতে মুক্ত করিয়া জনসমাজের কল্যাণের পথে চালিত করিয়াছেন। নদীর যে ধারা পাথরের বিঘ্ন পাইয়া নিষ্ফল স্রোতে জনসমাজ হইতে দূরে পর্বতের অন্তরালে বহিয়া চলিয়া-ছিল, কখনও কখনও যাহার আওয়াজ আমাদের কানে দূর হইতে পৌঁছাইত, সেই স্রোতধারাকে গান্ধীজী আজ মানুষের কল্যাণের জন্য পাহাড় কাটিয়া বাহির করিয়া সমাজের দৈনন্দিন জীবন-ভূমিকে প্লাবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু কত দীর্ঘদিনের দুঃখ, কত অসংখ্য সাধকের চেষ্টাই না

ইহার পিছনে থাকিয়া আজকার ঘটনাকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে ! এক শতাব্দীর বেশি সময় ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম, আর্যসমাজ প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্দোলন ধীরে ধীরে সমাজের অন্তরস্থ মলিনতাকে কিঞ্চিৎ দূর করিয়াছে, কুসংস্কারের নাগপাশকে প্রতিদিনের অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার দ্বারা ঈষৎ শিথিল করিয়াছে, কত চিন্তাশীল লেখকই মানুষের দৃষ্টিকে পুণ্যের আয়োজন হইতে মাটির দিকে ফিরাইয়াছেন। তাহারই সমবেত ফলে আজকার জীবনপ্লাবন সম্ভব হইয়াছে। যে পুণ্যলোভে ধর্মাত্মা সাধু তপস্যায় নিরত হন, সেই তপস্যার বীর্যকে আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষে কত তরুণ বিপ্লবী সমাজের কল্যাণের চেষ্টায় চেষ্টিত হইয়া অমোঘ মৃত্যুর পথকে বরণ করিয়াছে।

ইহাদের সকলের দান আজকার সত্যাগ্রহ সাধনার পিছনে রহিয়াছে। বহু সাধকের যুগ যুগান্তের প্রচেষ্টার দ্বারা ভারতের অন্তরে যে সাত্ত্বিক বল সঞ্চিত হইয়াছিল, লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহাই আবার মাটি ভেদ করিয়া, নূতন উৎসমুখে বাহির হইয়া সমাজের জীবনকে প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গান্ধীজীর একার কোন্ সাধ্য আছে যে শুধু তাঁহার চেষ্টায় সমগ্র দেশের রূপই তিনি ফিরাইয়া দিবেন ? সে অভিমানও তাঁহার নাই।

তাঁহার কীর্তি শুধু এইটুকু, বহুজনকে তিনি মৃত্যুবরণের জন্য নূতন সাধনপথের ইঙ্গিত দিয়াছেন। এবং সেই সাধনপথে অগ্রসর হইলে, আমাদের ইহজীবনে যে-সকল ক্লেদ সঞ্চিত হইয়া আছে, সেগুলি ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। গান্ধীজী বলেন, 'ইহকাল বা পরকাল বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু নাই। মনীষী জীন্‌স্

আমাদের ঐ ভেদবুদ্ধিটুকু নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। একটি অণুকণার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডেরই মত বিশাল তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে, মানুষকে সেই শিক্ষা তিনি দিয়াছেন।'

অতএব সত্যাগ্রহের দ্বারা মৃত্যু আমরা বরণ করিব, পরলোকে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য নয়, ইহলোকে সামাজিক মলিনতা ও প্রতি মানুষের চরিত্রের আবিলতাকে ধুইয়া মুছিয়া শুভ্র উজ্জ্বল মনুষ্যত্বের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিবার জন্য। এই হইল সত্যাগ্রহের মূলমন্ত্র। সত্যাগ্রহ সাধনায় ব্যক্তি অবশেষে মোক্ষ লাভ করিতে পারে সত্য, সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত মুক্তি সত্যাগ্রহীর কাম্য নয়। ব্যক্তি সমাজ হইতে অবিচ্ছিন্ন, বহুর মুক্তিতে একের মুক্তি, এই সত্যকে আশ্রয় করিয়া সত্যাগ্রহী অগ্রসর হন, এবং তাঁহার বিক্রমভরা পদক্ষেপের ফলে সমাজদেহের সঞ্চিত গ্লানি একে একে খসিয়া পড়ে।

যোগীর বিভূতিলাভের মত সমাজের দারিদ্র্য ঘুচিয়া যাইবে, পরাধীনতার গ্লানি মিটিয়া যাইবে, জগৎসমাজ হইতে শোষণের কলুষ মুছিয়া গিয়া সকল মানুষ মনুষ্যত্বের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহারই জন্য সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহ-তরুর মূলে নিজের জীবনরসকে সিঞ্চিত করেন। মৃত্যুঞ্জয়ী বহু বিগত সাধকের অমৃত আশীর্বাদ তাঁহাদিগকে সমর্থন করুক, জগতে যত বোধিসত্ত্ব জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্য সত্যাগ্রহীর চিত্তকে অমোঘ আবরণে আবৃত করুক। সত্যাগ্রহীর অন্তরে পরাজয়ের গ্লানি যেন না আসে, সত্যকে অবিচল নিষ্ঠায় আশ্রয় করিয়া তিনি যাত্রা করুন। সত্যাগ্রহের জয় হোক্! জয় হোক্!

সত্যাগ্রহ সাধনা

লবণ-আইন-অমান্যের একটি ঘটনা

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লবণ-আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের সময়ে বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে কংগ্রেসকর্মীগণ মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় সমবেত হন, এবং গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতে থাকে। সত্যাগ্রহীগণের উদ্দেশ্য ছিল তাঁহারা শুধু স্বয়ং লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, বরং গ্রামের জনসাধারণ যাহাতে সমবেতভাবে আন্দোলনে যোগ দেয় সেই জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতেও বিশেষ চেষ্টা চলিতে লাগিল যেন আন্দোলন সাধারণ লোকের মধ্যে সংক্রামিত না হয়। কাঁথি মহকুমায় বিভিন্ন কেন্দ্রে উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে, সেই সময়ের একটি কেন্দ্রে সত্যাগ্রহীগণের অভিজ্ঞতার বিষয়ে আলোচনা করিব।

যে সত্যাগ্রহশিবিরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেছি, সেখানে তখন প্রতিদিন প্রাতঃকালে জন দশেকের মত সত্যাগ্রহী মাথায় গান্ধী-টুপি পরিয়া হাতে জাতীয় পতাকা ধারণ করিয়া শোভাযাত্রায় বাহির হইতেন এবং যাত্রা শুরু হইতে না হইতে পুলিস বাহিনী তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বেত, লাঠি, ঘুঁষি বা লাথির আঘাতে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিত। অজ্ঞান অবস্থায় ক্ষতবিক্ষত দেহে সত্যাগ্রহীর দল পড়িয়া থাকিত, তাহাদিগকে শিবিরে ফেরত আনিয়া সেবা শুশ্রূষা করা হইত। পরের দিন আবার এমনিভাবে

নূতন দল বাহির করা হইত, আবার পুলিসের নির্যাতন চলিত। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যহই এই নিষ্করুণ দৃশ্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া শেষে বাড়ি ফিরিয়া যাইত। বাংলা দেশের বীর যুবকের দল গভর্মেণ্টের নিকট দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতেছে না, স্বীয় ব্রতে অটল হইয়া রহিয়াছে, ইহাতে সকলের শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিত, গ্রামের সকলে সত্যাগ্রহশিবিরে শ্রদ্ধাবশত চালকলা তরিতরকারি পৌঁছাইয়া দিত বটে, কিন্তু নিজে ঐ সত্যাগ্রহীদলে যোগ দিবার বাসনা অথবা লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার উৎসাহ কাহারও মধ্যে দেখা যাইত না। গ্রামবাসীরা সত্যাগ্রহীগণকে যেন স্বতন্ত্র জগতের জীব বলিয়া মনে করিত, তাঁহাদিগকে সম্মান করিত, ভক্তি দেখাইত, কিন্তু নিজের জন অথবা স্বজাতি বলিয়া ভাবিতে পারিত না।

এরূপ অবস্থায় সত্যাগ্রহীগণ ক্রমশ অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। নেতৃস্থানীয় দুই-একজন সত্যাগ্রহী, যুবকগণের উপরে নির্যাতন আর সহ্য করিতে না পারিয়া মনে করিলেন, প্রত্যহ নিষ্ফল নির্যাতন ভোগ করিয়া লাভ নাই, সত্যাগ্রহের বৃদ্ধি বা প্রসারের তো কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, অতএব সকলে মিলিয়া একসঙ্গে একদিন নির্যাতনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়া যা'ক, তাহার পর যাহা হইবার হইবে। কিন্তু ইহার দ্বারাও যে জনসাধারণের নিশ্চেষ্ট ভাবকে ভাঙা যাইবে, এমন ভরসা কাহারও ছিল না।

যাহাই হউক, অবস্থা যখন এরূপ সঙ্গিন হইয়া উঠিয়াছে, তখন জনৈক সত্যাগ্রহীর মনে নূতন এক বুদ্ধির উদয় হইল এবং

কর্মের ধারা পরিবর্তিত করার সঙ্গে সঙ্গে দুইদিনের মধ্যেই সেই কেন্দ্রের চারিপাশে অভাবনীয় উৎসাহসঞ্চারের ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে পর্যন্ত লবণ-সত্যাগ্রহের আন্দোলন আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িল। কি কৌশল অবলম্বন করা হইল এবং কেমন-ভাবেই বা গ্রামবাসীগণের নিরুৎসাহতা ও নিষ্ক্রিয়তা রূপান্তরিত হইল তাহা আমাদের সকলের প্রণিধানের যোগ্য, কেননা ইহার মধ্যে শিখিবার বস্তু অনেক আছে।

যে দিনের ঘটনা বলিতেছি, তাহার পূর্বাহ্নে একজন সত্যাগ্রহীকে শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকার ফলে অসম্ভব প্রহার সহ্য করিতে হইয়াছিল। নির্যাতনের তাড়নায় শরীরের সর্বত্র কালশিটা পড়িয়া গিয়াছিল, এমন কি মুখের নানা অংশ ফুলিয়া চেহারা পর্যন্ত বিকৃত হইয়া যায়। ফোলার জন্য চোখ বুজিয়া গিয়াছিল এবং চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে চোখ মেলিতে হইতেছিল। পরদিন অবশ্য তাঁহার যাইবার কথা নয়, নূতন কয়েকজন সত্যাগ্রহীর, অথবা ইতিমধ্যে কয়েকদিন বিশ্রামের ফলে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের যাইবার কথা। যে সত্যাগ্রহী নেতার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তিনি সেদিন নূতন এক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন, কাল যে সত্যাগ্রহী সর্বাপেক্ষা অধিক জখম হইয়াছে, আজ তাহাকেই আবার শোভাযাত্রার সম্মুখে থাকিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সকলে এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, গত দিনের নির্যাতনের ফলে যে আজ উত্থানশক্তিরহিত হইয়া আছে, তাহাকে যদি আজ পুনরায় পুলিসবাহিনীর সম্মুখীন হইতে হয়,

তবে তাহার মৃত্যু অবধারিত, এ বিষয়ে কাহারও সংশয় রহিল না। কিন্তু প্রস্তাবকারী নেতা অটল। তখন আহত সত্যাগ্রহীকে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি দ্বিধাশূন্য মনে সম্মতি দিলেন এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ইতিমধ্যে বাহিরে দর্শকবৃন্দ সমবেত হইয়াছিল, মুহূর্তে তাহাদের মধ্যে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া আজকার ঘটনা কি পরিণতি লাভ করে তাহা জানিবার জন্য শঙ্কায় উদ্বেলিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল। সত্যাগ্রহীর দল সেদিনও যথারীতি পতাকা হস্তে ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্মুখে সকলে দেখিতে পাইল পূর্বদিনের আহত যুবকটি চলিয়াছে, তাহার মুখ পূর্বদিনের প্রহারের ফলে ফুলিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার চলনে কোনও কুণ্ঠার চিহ্ন নাই। সকলে আগাইয়া চলিল। দর্শকগণ নিস্তব্ধ, কাহারও কণ্ঠে কোন শব্দ নাই। দূরে পুলিসের বাহিনীকে দেখা যাইতেছিল। এমন সময়ে সহসা গ্রামের কয়েকজন নারী পথের উপর আগাইয়া আসিলেন এবং সত্যাগ্রহীদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা এ দৃশ্য চোখে দেখিতে পারিব না, আজ আপনারা ফিরিয়া যান, আমরা যাইতেছি!'

সত্যাগ্রহীগণ ফিরিলেন না। কিন্তু মায়ের দল তাঁহাদিগকে সম্মুখে, পাশে, পশ্চাতে ঘেরিয়া যেন স্বীয় কল্যাণময় পক্ষপুটের দ্বারা আবৃত করিয়া আগাইয়া চলিলেন। পুলিসের কর্মচারীগণও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং সেদিন বিনা বাধায় লবণনির্মাণের যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। পরদিন হইতে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে নরনারীগণ

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পুলিসের প্রতিরোধচেষ্টা হয়তো পরেও সমানভাবে চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু জনসাধারণের সত্যাগ্রহ মনের দিক দিয়া সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হইয়া উঠিল।

ঘটনাটি সে সময়ের ইতিহাসে সামান্য হইতে পারে, কারণ বাংলা দেশে এবং ভারতবর্ষের বহু স্থানে অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হয়তো হয় নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে আমাদের পক্ষে যে শিক্ষণীয় বস্তু আছে এবার তাহারই আলোচনা করা যাক।

একটি উপমা

সাধারণ মানুষ অনেক কাজকেই বুদ্ধির দ্বারা ভাল বলিয়া বুঝিতে পারে, চিনিতে পারে, এ কথা ঠিক। কিন্তু পুরাতন অভ্যাস বা সংস্কার মানুষের তো সহজে ভাঙিতে চায় না। সমাজের মধ্যে চারিদিকে যদি নির্বীর্য ব্যবহার দেখা যায়, সকল ক্ষেত্রেই যদি আলস্য নিশ্চেষ্টতা অথবা পরাজয়ের কালিমা মাখানো থাকে, তাহা হইলে হঠাৎ জীবনের কোনও এক নূতন ক্ষেত্রে, আচরণের ভিতরে, মানুষ বীর্যের পরিচয় দিবে, ইহা আশা করা যায় না। কিন্তু সেই অবস্থার মধ্যেও অল্পসংখ্যক মানুষ নিজের মনের মধ্যে দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া সাহসের ভরে সমাজে নূতন আচরণের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করিলেই তাহা সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন জনসাধারণকে জাগাইয়া তোলে না। কাঠের উনানে আঁচ দিতে হইলে কিছু শুখনা পাতা বা খড়কুটার মত সহজদাহ্য পদার্থের প্রয়োজন হয়। কাঠ যদি কাঁচা হয়, কুচির

পরিমাণ যদি সামান্য হয়, তাহা হইলে উনান ধরিতে বিলম্ব ঘটিতে পারে, অধিক ধোঁয়া বাহির হইতে পারে, কিন্তু অধ্যবসায়ের সঙ্গে লাগিয়া থাকিলে শেষ পর্যন্ত উনান ধরিবেই ধরিবে। হয়তো তাহার জন্য কুচির পরিমাণ কিছু বাড়ানোর প্রয়োজন হইতে পারে, এবং দৃষ্টি রাখিতে হয় সেগুলি যেন ঠিকমত জ্বলে। অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সঞ্চারিত করিতে হইলে হয়তো সত্যাগ্রহীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহারা নির্যাতনে ধৈর্য না হারায়, নির্যাতনের মাত্রা গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও যদি ব্রতে নিষ্ঠায় অবিচল থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের চিত্তকে তাহা নিশ্চয়ই স্পর্শ করিবে। এবং এই সম্ভাবনা যে কত দ্রুত, কোন্ অপ্রত্যাশিত পথে দেখা দেয়, তাহা মেদিনীপুরের আলোচিত দৃষ্টান্তের মধ্যে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সত্যাগ্রহীর সংকল্প গ্রামের নরনারীর হৃদয়কে একদিন অকস্মাৎ বিদ্যুৎশিখার মত স্পর্শ করিল।

ধর্মতলায় ছাত্রগণের সত্যাগ্রহ

অতি অল্পদিন পূর্বেও কলিকাতার রাজপথে অনুরূপ একটি ঘটনার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। সেদিন কলিকাতার ছাত্রদল পথে পথে শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছে, এমন সময়ে ধর্মতলার পথপ্রান্তে পুলিস তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিল। তাহারা না ফিরিয়া সারা দুপুর পথের উপরে বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার পর হঠাৎ কয়েকজন পতাকা হস্তে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করার সঙ্গে

সঙ্গে জনতার উপর আক্রমণ শুরু হইল। প্রথমে ছাত্রদল কিছু বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যে মুহূর্তে একজন গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হয়, সেই মুহূর্তে অপর সকলে সেই গুলির মধ্যেই অটল হইয়া দাঁড়াইয়া যায়। তাহারই ভিতরে আহতগণকে সরাইয়া চিকিৎসার জন্য পাঠানোর আয়োজন চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী দর্শকবৃন্দ ক্ষিপ্ত হইয়া পুলিসের উপরে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতেছিল, ছাত্রগণ তাহাদিগকেও নিরস্ত করিবার চেষ্টা করে। দুই-এক জন পুলিসের কর্মচারী জনতার দ্বারা প্রহৃত হইতেছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করা হয়। তখন ক্ষণে ক্ষণে গুলি চলিতেছিল, কিন্তু ধর্মতলার শোভাযাত্রাকারীগণ পিছন ফিরে নাই। সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি এবং পরদিবস বৈকাল পর্যন্ত অনাহারে অনিদ্রায় ছাত্রদল সেই স্থানে বসিয়া থাকে। অপরাহ্লে আবার গুলি আরম্ভ হয়, হতাহতের সংখ্যা পূর্বরাত্রি অপেক্ষা অধিক হয়, তবু ছাত্রদের দল ফিরে নাই। অবশেষে পুলিসবাহিনী পথ ছাড়িয়া দেয়, এবং শান্ত দৃঢ়তার সহিত শোভাযাত্রাকারীগণ লালদীঘি পরিক্রমার পর স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। তাহাদের দাবি সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইল।

কে জানিত আমাদের প্রতিদিনের চেনা সাধারণ মানুষ এমনভাবে মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারিবে? প্রতিদিনের আচরণে বা চিন্তায় যেখানে আমরা সাহসের রশ্মিরেখা খুঁজিয়া পাই না, হয়তো সেখানেই এমনিভাবে অকস্মাৎ একদিন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্যের রশ্মি ঊষাকালের আলোকচ্ছটার মত দেখা দেয়, গগনে

গগনে সেই আলো বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে, জাতির জীবনে নবপ্রভাতের উদয় হয়। যাহারা আজ শীর্ণ জীর্ণ, যাহাদের চরিত্র গ্লানিযুক্ত, উপযুক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শে সেই চরিত্রই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে. সে বিষয়ে সংশয় নাই। তাই আজ ভারতের গ্লানি যতই পুরাতন হউক না কেন, সত্যাগ্রহীর দল যদি স্বীয় চেষ্টার দ্বারা অন্তরের বহ্নিকে জাগ্রত করিতে পারে, দুঃখবরণের দুর্গম পথে চলিয়া মৃত্যুর ভয়কে অতিক্রম করিতে পারে, তবে অবশিষ্ট মানুষ নিশ্চয়ই জাগিবে, এ ভরসা আমরা করিতে পারি।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে মহাত্মা গান্ধী যেদিন গ্রেপ্তার হন তাহার পর সর্বত্র তাঁহার নামে একটি বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। গান্ধীজী স্বয়ং সেই বাণী রচনা করেন নাই। শ্রীযুক্ত পিয়ারেলাল বোম্বাইএ ৭ই এবং ৮ই আগষ্ট তারিখে গান্ধীজীর দ্বারা প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে কিছু কিছু বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সেই বাণীটি রচনা করিয়াছিলেন। রচনা সার্থক হইয়াছিল, ভাষা এবং ভাবের পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, সেই বাণী গান্ধীজীর মত সত্যাগ্রহীর পক্ষেই সম্ভব। সেই বাণীর মধ্যে ছিল—সত্যাগ্রহীগণকে অগ্রসর হইতে হইবে মরণের অভিমুখে, জীবনের অভিমুখে নয়। মানুষের পর মানুষ যেদিন মৃত্যুর সন্ধানে অগ্রসর হইবে, মৃত্যুর সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করিবে, সেই দিনই জাতি নূতন জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব তোমাদের সংকল্প হউক, ব্রতে অবিচল থাকিয়া—

করিব, না হয় মরিব॥

উপমার পুনরুল্লেখ

পূর্বে একটি উপমার ব্যবহার করা হইয়াছে। সত্যাগ্রহী যেন উনানে আঁচ দিবার জন্য নিযুক্ত ঘুঁটে বা কাঠের কুচির মত। কাঠের কুচিতে নিজের গুণে সহজে আগুন ধরে, এবং সেই আগুন পর্যাপ্ত হইলে বাকি কাঠেও আগুন ধরিয়া যায়। কিন্তু কাঠ ভিজা হইলে রাঁধুনী আগে তাহাকে রৌদ্রে দিয়া শুখাইয়া লয়। ভারতবর্ষের সমাজ ও জীবন এমনই নিস্তেজ হইয়া আছে যে তাহা ভিজা কাঠের মত। হয়তো ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন বা ১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের মত বিরাট মুহূর্তে তাহা অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠে। আগুনের শিখার মত, নূতন জীবন গঠনের উৎসাহ অকস্মাৎ জাতির জীবনে দেখা দেয়। কিন্তু আবার দুই-এক বৎসরের মধ্যে শিখা নিভিয়া যায়, ভিজা কাঠ হইতে যেমন প্রচুর ধূমের উদ্গার হইয়া মানুষের চোখে জল আনে, এ ক্ষেত্রেও তেমনই ঘটিতে থাকে। দুই আন্দোলনের মধ্যবর্তী কালে জাতির জীবন পুনরায় ধূমের জাল বিস্তার করে, সময়ে সময়ে কণ্ঠরোধ হইয়া আসে। কিন্তু ধূম বাহির হইলেও আশার কথা হইল এই যে, নীচে তখনও আগুন জ্বলিতেছে, আমরা এই আশ্বাস লাভ করিতে পারি। জাতি নূতন জীবনলাভের জন্য আগ্রহান্বিত, কিন্তু নূতন সমাজগঠনের চেষ্টায় পুরাতন অভ্যাসগুলি বা সংস্কারসমূহ নানাবিধ অন্তরায়ের সৃষ্টি করিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিলে আমাদের হতাশার আর কোনও কারণ থাকে না। কেবল সুদক্ষ রাঁধুনীর মত উনান ধরাইবার জন্য

অবশিষ্ট ভিজা কাঠকে রৌদ্রে দিয়া শুখাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা উচিত।

সমাজের তমোরাশিকে দূর করিবার চেষ্টা

অতএব জাতির জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্য আমাদের দশ বৎসর অন্তর একবার করিয়া সংগ্রামের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে পুরাতন আচরণের পরিবর্তে নূতন আচরণের প্রতিষ্ঠার দ্বারা পুঞ্জীভূত আলস্য অবসাদ ও ভয় প্রভৃতি সর্ববিধ তামসিকতার নাগপাশকে শিথিল করিতে হইবে। তবেই সময়কালে আইন-অমান্যের মত সংগ্রাম সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

কিন্তু দৈনন্দিন যজ্ঞের দ্বারা সমাজদেহের তমোবন্ধনকে দূর করিবার সেই উপায় কী? গান্ধীজী মনে করেন, গঠনকর্মের আঠার দফা কর্মের দ্বারা আমরা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারি। জাতির জীবনে যেখানে বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, ভেদের বৈতরণী সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে একজন মানুষের সঙ্গে অপর একজন মানুষের বন্ধুত্ব বা সহযোগিতা স্থাপনের চেষ্টার দ্বারা আমরা বৈতরণীর উপরে সেতু রচনা করিব। হিন্দুর সহিত মুসলমানের সম্প্রদায় হিসাবে প্রীতি বা সদ্ভাব নাই। সেখানে মানুষে মানুষে বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া আমরা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতু রচনা করিব। তবেই হয়তো জাতির সংগ্রামের কোনও শুভ-মুহূর্তে হঠাৎ একদিন দেখা যাইবে, উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের আরও কাছে, ঐক্যের বন্ধনে ঘেঁসিয়া আসিয়াছে।

দামোদর নদের পাশে বাঁধের মধ্যে গ্রীষ্ম ও শীতকালে ইঁদুর গর্ত করে। প্রথমে সেই গর্ত দিয়া বর্ষার সময়ে ক্ষীণধারায় জল চুয়াইতে থাকে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিতে দেখিতে সেখানে একটি খাল কাটিয়া যায় এবং একদিন মুহূর্তের প্লাবনে সেই পথকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত দেশের মাঠ ঘাট ভাসিয়া যায়। দামোদরের বর্ষার স্রোতের কাছে যেমন মাটির বাঁধ তুচ্ছ, মানুষের প্রাণশক্তির প্লাবনের সম্মুখেও তেমনই পুরাতন সংস্কারের বন্ধনও তুচ্ছ হইয়া যায়। কেবল প্রয়োজন, প্রতিদিবসের আচরণের দ্বারা তাহাকে ক্ষীণ করা, শিথিল করা। কেমনভাবে সুকৌশলে আমাদের আলস্যের বন্ধনকে শিথিল করা যায়, তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি।

ধরুন, সত্যাগ্রহী গ্রামে খাদি বা গ্রামশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। গ্রামে পুনরায় চরকা চলিলে বা অন্যবিধ ছোটখাট শিল্পের বিস্তার হইলে যে গরিব গৃহস্থ অবসর সময়ে কিছু রোজগার করিয়া বাঁচিতে পারে, ইহা সকলেই বোঝে। কিন্তু পারে না কেন? তাহারই সূক্ষ্ম কারণ অনুসন্ধান করিয়া সত্যাগ্রহীকে নূতন ধারায় কর্ম প্রবর্তন করিতে হইবে। হয়তো দেখা যাইবে, কোন গ্রামে টাকু হয় না, কামার নাই, বা যে আছে সে ভাল টাকু গড়িতে পারে না। তখন তাহার পিছনে লাগিয়া, নিজে সাহায্য করিয়া, হাতে কলমে শিখাইয়া, তাহাকে মানুষ করিতে হইবে। হয়তো গ্রামের ছুতার ভাল চরকা গড়িতে পারে না। তখন কোন্ ধরনের চরকা সহজে নির্মাণ করা চলে, অথচ যাহার দ্বারা দ্রুত সূতাকাটা যায়, সত্যাগ্রহী সে-বিষয়ে

গবেষণা করিয়া সেইখানেই সিদ্ধিলাভ করিবেন। উপযুক্ত চরকা গড়া শেষ হইলে, তাহাতে ভাল সূতাকাটা সকলে শিখিলে, গাঁয়ের লোকে বুঝিবে, হাঁ এইখানেই আমাদের সমস্যার সমাধান হইতে পারে, বাহিরের উপরে নির্ভর করার দরকার নাই।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁতী সানা বদলাইয়া খাদি বুনিতেছে বটে, কিন্তু খাদির খরিদদার নাই। অথবা কাটুনী রাজি আছে, কিন্তু তাহার তুলা কিনিবার পয়সা নাই। তখন হয়তো কাটুনীকে এক সের তুলা দিয়া তাহার পরিবর্তে আধসের সূতা লইতে হইবে, বাকি ছাঁটাই বাদে আধ সের তাহার বানি বলিয়া ধরা হইবে। সে দুই তিন খেপ সূতা কাটিয়া নিজের কাপড়ের জন্য যথেষ্ট সূতা রোজগার করিয়া লইবে, হয়তো তাঁতীর বানিও সূতায় দিবে। এদিকে সত্যাগ্রহীর ঘরে যে সূতা সঞ্চিত হইতে থাকিবে, তাহা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িতে বেচিয়া আসিতে হইবে। তাহাদিগকে প্রথমে বুঝাইতে হইবে যে, তাহারা যদি দেশের দরিদ্র গৃহস্থের সঙ্গে খাদি পরিয়া নূতন সহযোগিতার সূত্র না গড়ে তবে সমাজকে আবার নূতনভাবে গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না। মিলের কাপড় আপাতত সস্তা বটে, কিন্তু সব দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা মহার্ঘ হয়। কেন না মিলমজুর, অথবা যে মজুর কল নির্মাণ করিয়াছে, বা কয়লার কাজ করিয়াছে, তাহারা কেহই পরিশ্রমের উচিত মূল্য পায় না। আবার যদি বা কিছু পাইয়া থাকে, তাহাদের পাওয়ার ফলে কোথাও না কোথাও আজকার আর্থিক ব্যবস্থার ফলে কোন না কোন শিল্পী বেকার হইয়া যায়। যে কাপড় সস্তা

করিতে মজুরকে বঞ্চনা করিতে হয়, গ্রামের শিল্পীকে বেকার করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে ধনীর ভাণ্ডারে টাকা জমা হয়, এরূপ 'সস্তা' সামগ্রী ত অকল্যাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সর্বজনের কল্যাণ তাহার দ্বারা কখনও সাধিত হইতে পারে না। খাদি ও কুটিরশিল্পের মারফত আমরা যেমন সকলকে কাজ দিতে চেষ্টা করি, তেমনই সকলে শারীরিক শ্রম করিয়া যথাসম্ভব সমান রোজগার করুক ইহাও চাই। সত্যাগ্রহী এইভাবে নূতন উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে ধনের সমবণ্টনের কথাও প্রত্যক্ষভাবে মানুষের মধ্যে প্রচার করিতে থাকিবেন।

প্রতি দিবসের নিরবচ্ছিন্ন সুনিপুণ চেষ্টার দ্বারা দেশের পুঞ্জীভূত আলস্যকে কিভাবে ক্ষীণ করা যায়, তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। কিন্তু ইহার জন্য সত্যাগ্রহীর পক্ষে দুইটি বস্তুর প্রয়োজন আছে। তিনি কোনও দিন ব্যর্থতার দ্বারা যেন আক্রান্ত না হন। শ্রান্তি আসিলে বিশ্রাম লউন, কিন্তু বিশ্বাস তাঁহার যেন উজ্জ্বল থাকে, সর্বদা বুদ্ধিযুক্ত হয়। অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা ভারতের সঞ্চিত তমোরাশিকে কখনই দূর করা যাইবে না, উনানে ধোঁয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে, আগুন জ্বলিবে না।

দ্বিতীয় প্রয়োজন, কাজ যতই মন্থর হউক না কেন, তিনি যেন বাহিরের সাহায্যের উপরে পারতপক্ষে নির্ভর না করেন। টাকুর অভাব ঘটিলেই যদি কলিকাতায় ছুটিতে হয়, বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটিলেই যদি শহরবাসী ধনীর আশ্রয় লইতে হয়, তাহা হইলে আমাদের চেষ্টার দ্বারা খাদি উৎপন্ন হইবে সত্য, কিন্তু যে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন গান্ধীজী স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য

বলিয়া মনে করেন, গঠনকর্মের সুচারু ব্যবস্থার দ্বারা যাহা সৃষ্টি করিতে চা'ন, যাহার অভাবে পূর্বে ভারতবাসী চরকা কাটিলেও স্বাধীনতা হারাইয়াছিল, সেই মানস-বল এবং পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার সূত্র সৃষ্টি করা যাইবে না। তাহার জন্য আত্মনির্ভরশীলতার উদ্রেক করিতে হইবে এবং উৎপাদনব্যবস্থাকে যথোপযুক্ত মাত্রায় বিকেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। গ্রামের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তবে গ্রামের সহিত গ্রামান্তরের, দেশের সহিত দেশান্তরের, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রান্তরের স্বেচ্ছায় সহযোগিতা স্থাপনের সময় আসিবে। সে সহযোগিতায় অকল্যাণ নাই, কেননা তাহা পশুবলের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়।

বুদ্ধিযুক্ত অনির্বাণ মঙ্গলকর্মের দ্বারা সত্যাগ্রহী ভিজা কাঠকে শুখাইবেন, তবেই সর্বসাধারণের মন সময়কালে প্রদীপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

রাজনৈতিক প্রচার

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি শুধু চরকা-খদ্দর করিলেই স্বরাজ আসিয়া যাইবে? রাজনৈতিক কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই, সেটি কেবল দশ বৎসর অন্তর একবার করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে দেখা দিলেই স্বরাজ আসিয়া যাইবে?

না তাহা নহে। তবে আমরা সাধারণত রাজনৈতিক প্রচার বলিতে যাহা বুঝি, গান্ধীজী তাহা হইতে স্বতন্ত্র শিক্ষার এক পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং সেই উপায়ে আরও সুফল লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। একটি বাস্তব ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষয়টির আলোচনা করা যা'ক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর বাংলা দেশে তখন সবে খাদ্য-শস্যের অনটন আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গের এক জেলায় চাষীদের মধ্যে অন্নাভাবের সূচনা দেখা দেয়। জেলার সদরে সংবাদ আসার পর, বাংলার সর্বত্র যেমন হয়, যাবতীয় সেবাসমিতির কর্মীগণ তৎক্ষণাৎ চাঁদা তুলিয়া রিলিফের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যাহারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে লাগিল, তাহার আশ্চর্য হইল না, বিরক্ত বা অবমানিত বোধ করিল না, স্বীয় দারিদ্র্য বা দুরবস্থার জন্য কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল না, চেষ্টার দ্বারা নূতন অন্ন উৎপাদনের উপায়ের বিষয় চিন্তা করিল না, শুধু ভিক্ষান্ন প্রাপ্তিতে কাহার কি পরিমাণ ন্যায্য দাবি আছে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে লাগিল। রিলিফের কর্মীগণ তাহাদের প্রয়োজনমত চালডাল দিতে না পারিলে তাহারা অভিযোগ করিত, আবার মাঝে মাঝে সদরে হাকিমের নিকট নালিশ করিবে, এমন ভয়ও দেখাইত। চাষীদের ধারণা হইয়াছিল যে, রিলিফের অন্ন গভর্মেণ্টের প্রদত্ত সম্পত্তি, অতএব ভৃত্যগণ যথারীতি ভিক্ষা না দিলে মালিকের নিকট অভিযোগ করা চলিবে। কে ইহাদিগকে এরূপ সংবাদ দিয়াছিল জানা নাই। সম্ভবতঃ কেহই দেয় নাই, তবু বহু বৎসরের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার নিষ্পেষণে এমনই একটি ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

এমন অবস্থার মধ্যে জনৈক কংগ্রেসকর্মী অনাহারজনিত মৃত্যুর এক সংবাদ পাইয়া কোনও এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। মৃতদেহের সৎকার তখনও হয় নাই, এবং সেদিন গ্রামে হাটবার ছিল বলিয়া বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। কংগ্রেসের

কর্মীটি পৌঁছিয়া মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নূতন রিলিফের কেন্দ্র হয়তো খোলা হইবে এইরূপ অনুমান করিয়া অনেকে সমবেত হইল এবং স্বীয় দুঃখদুর্দশার বিস্তারিত কাহিনী জ্ঞাপন করিতে লাগিল। কিন্তু কংগ্রেসের কর্মীটি জনতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের গ্রামে কাহারও ঘরে কি ভাত ছিল না? যদি একজনের ঘরেও খাদ্য থাকে, তাহা হইলে এই ব্যক্তি আপনাদের চোখের সামনে অনাহারে মরিল কেন? জনতা চুপ করিয়া রহিল। তখন তিনি তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, তাহাদের প্রত্যেকের যেমন এবিষয়ে দায়িত্ব আছে, গভর্মেণ্টেরও তেমনই দায়িত্ব আছে। তৎপরে তিনি জনতাকে পরামর্শ দেন, আপনারা চাঁদা তুলিয়া সদরে তার পাঠান, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট যেন মৃত্যুর যথাযথ কারণ সম্বন্ধে পত্রপাঠ অনুসন্ধান করেন। আপনারাও লাস লইয়া থানায় যান, এবং ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া মৃত্যু অনাহারজনিত কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষার দাবি করুন।

অতঃপর তদনুযায়ী ব্যবস্থা হইল। হাটতলায় এক পয়সা দুই পয়সা চাঁদা তুলিবার পর একটি কমিটি গঠন করিয়া তাহার হাতে ব্যয়ভার অর্পণ করা হইল এবং গভর্মেণ্টের বিভিন্ন কর্মচারীর নিকটে তার প্রেরণ করা হইল। মৃতদেহকে পরীক্ষার জন্য মহকুমার সদরে লইয়া যাওয়া হইল। প্রথমে কর্তৃপক্ষ মৃত্যু অনাহারের ফলে ঘটিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে চা'ন নাই, কিন্তু অবশেষে সরকারী ডাক্তার শবব্যবচ্ছেদ করিয়া যথাযথ রিপোর্ট দেওয়ার ফলে হাকিমমহলে রীতিমত সাড়া পড়িয়া গেল।

ইহার অল্পকালের মধ্যে বাংলা গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে সেই গ্রামে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে যথেষ্ট সরকারী রিলিফের আয়োজন হইল। শহরের পক্ষ হইতে ভিক্ষান্ন বিতরণের আর প্রয়োজন হয় নাই।

একজন কংগ্রেসকর্মীর সুনিপুণ কর্মচেষ্টার ফলে লোকে নূতন শিক্ষা লাভ করিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া দারোগা ডাক্তার চৌকিদার প্রভৃতি যাবতীয় বেতন-ভোগী কর্মচারী যে প্রজার সুখসুবিধার আয়োজনের জন্য আছেন, এই শিক্ষা তাহারা হাতে কলমে লাভ করিল। উপরন্তু আরও দেখিল যে, ন্যায্য দাবি আদায় করিতে হইলে স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে যেমন প্রত্যেককে সচেতন হইতে হয়, তেমনই আবার ঐক্যবদ্ধ হইয়া অধিকার আদায়ের জন্য কিছু পরিশ্রমও করিতে হয়। নয়তো দাবি শুধু দাবিই থাকিয়া যায়, আদায় আর হয় না।

বাংলা দেশেই হউক অথবা অন্যত্র যে কোন দেশেই হউক, কোন না কোন শাসনযন্ত্র সমাজে সর্বত্র বর্তমান। বাংলা গভর্মেণ্টের অধীনে বহুসংখ্যক বিভাগ আছে, কৃষিবিভাগ, জলসেচের বিভাগ, গরুমহিষের চিকিৎসার বিভাগ, পথঘাট নির্মাণ বা সংস্কার করিবার বিভাগ ইত্যাদি। এগুলি যদি প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তবে প্রজার জীবনের অনেক দুঃখভার কমিয়া যাইবে। বিভিন্ন বিভাগগুলির কর্তব্য কি, সেই কাজে প্রজার পক্ষ হইতে সহযোগিতা কি উপায়ে সম্ভব, তাহা মানুষকে শেখানো প্রয়োজন। প্রজা বিভিন্ন বিভাগের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে, তাহার নির্দেশ মানিলে, অনেক ক্ষেত্রে সহজে লাভবান হইতে পারে।

কিন্তু যদি বার বার সহযোগিতা সত্ত্বেও বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার সম্ভব না হয়, যদি গরিব প্রজার স্বার্থের জন্য পরিচালিত না হইয়া সেগুলি ধনী বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থপুষ্টির জন্যই নিয়ত ব্যবহৃত হয়, তখন প্রজাসাধারণ সেরূপ প্রতিষ্ঠানকে শোধন করিবার জন্য অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানকে শুধু অচল করিবার উদ্দেশ্যেই নহে। প্রজার লক্ষ্য হইবে, নিজেরা অসহযোগের ফলে নানাবিধ অসুবিধা অথবা নির্যাতন ভোগ করিয়াও ধৈর্য হারাইবে না। তাহার ফলে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্মচারীগণের হৃদয়কে স্পর্শ করা সম্ভব হইবে, আঘাত দিয়া নয়, আঘাত সহিয়া। তখন বর্তমান কর্মচারীগণ প্রজার দাস হইয়া যাইবে এবং আনন্দচিত্তে প্রতিষ্ঠানের রূপ বদলাইয়া প্রজার স্বার্থপুষ্টির উদ্দেশ্যেই তাহা পুনঃপ্রচলিত করিবে।

শেষ কথা

এইরূপ রাজনৈতিক শিক্ষা, মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে বোধ, স্বীয় পরিশ্রম এবং যথারীতি কর্তব্যসাধনের ফলে ন্যায্য অধিকার লাভের কৌশল, সত্যাগ্রহী ক্রমে ক্রমে জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শিখাইবেন। নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা এবং সুকৌশল কর্মপন্থা আশ্রয় করিয়া তিনি সমাজের মধ্যে সহযোগিতা, সম্পদে বিপদে এক হইয়া চলার অভ্যাস গড়িয়া তুলিবেন। পুরাতন অধিকার অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা লাভই

হউক, অথবা নূতন আর্থিক আদর্শ অনুযায়ী বৈষম্যশূন্য নূতন সমাজরচনাই হউক, উভয় বিষয়ে সাফল্যই যে স্বীয় কর্মতৎপরতা এবং দুঃখবরণের প্রতিজ্ঞার উপরে নির্ভর করে, এই শিক্ষা লোকে স্বীয় অভিজ্ঞতার বশে প্রত্যক্ষভাবে অর্জন করিবে।

মানুষে এই শিক্ষা লাভ করিবে যে, অহিংস-বিপ্লবের জন্য নিজের রক্তপাত করিতে হয় সত্য, কিন্তু শুধু রক্তপাতের মন্ত্রস্পর্শে সব কার্য সুসিদ্ধ হয় না ; নিরবচ্ছিন্ন ঘর্মপাতেরও প্রয়োজন আছে। প্রতিদিবসের নিরবচ্ছিন্ন সুকৌশল কর্মচেষ্টার দ্বারা আমাদিগকে ভবিষ্যৎ সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিতে হইবে, ধনসাম্য এবং রাষ্ট্রীয় সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন্ প্রতিষ্ঠানে কি কি পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন, তাহা বারংবার চিন্তা করিয়া, পরীক্ষা করিয়া, সমাজের সর্ববিধ ব্যবস্থার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

কিন্তু যদি আমরা ভাবি যে, একবার অকস্মাৎ বিপুল চেষ্টার প্রভাবে রাজশক্তিকে অধিকার করিয়া তৎপরে জনকয়েক বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপরে সমাজের পুনর্গঠনের যাবতীয় ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব, তবে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হইবে সত্য, কিন্তু সাধারণ মানুষের স্ব-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তাহার জন্য অবিরাম জাগ্রত চেষ্টা এবং জাগ্রত দৃষ্টির প্রয়োজন। স্বরাজের জন্য উপযুক্ত মূল্য আমাদিগকে দিতেই হইবে। পাইকারী হারে দুঃখবরণের ভিতর দিয়া আংশিকভাবে সে মূল্য মেটানো যায় সত্য, কিন্তু বেশি দিতে হয়, দফায় দফায় প্রতিদিবসের জাগ্রত কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা।

আমাদের চেষ্টা যদি সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তবে আজ পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে যে সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্ষয় হইতে হইতে অবশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তাহার স্থানে নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিবে, যেখানে কেহ কাহারও উপর অন্যায় দাবি করে না, সকলে সকলের জন্য পরিশ্রম করে, সকলে সকলের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য ক্লেশ ভোগ করিতে প্রস্তুত থাকে।

কিন্তু গঠনকর্মের এমন নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা মানুষের সমাজে হয়তো কার্যত সম্ভব নয়। জগন্নাথের রথ যেমন থমকিয়া থমকিয়া আগাইয়া চলে, মানুষের মনও তমসার গাঢ় নিদ্রা হইতে জ্যোতির উদয়পথে আকস্মিক এবং অসমান বেগে আগাইয়া চলিতে থাকে। তাই অহিংসসাধনায় গঠনকর্মের পরিপূরক হিসাবে সত্যাগ্রহ সংগ্রামেরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু সত্যাগ্রহ তখনই শুধু সার্থক হইতে পারে, যদি সংগ্রামের মধ্যে এবং দুই সংগ্রামের মধ্যবর্তী সমস্ত অবসরকালেও সত্যাগ্রহীগণ নিরলস চেষ্টার দ্বারা সমাজে তমোরাশির বন্ধনকে যথেষ্ট শিথিল করিতে সমর্থ হন। সংগ্রামের মাদকতাশক্তি আছে সত্য, কিন্তু গঠনকর্ম পিছনে না থাকিলে অহিংস সত্যাগ্রহ অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবেই হইবে।

ক্রোপট্‌কিন এক স্থানে লিখিয়াছিলেন যে, ফরাসী দেশে বিপ্লব সাধিত হইল বটে, অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিকার হইতে রাজদণ্ড অকস্মাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়ত্তে আসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু তাহা তো বিপ্লবের আয়োজনমাত্র, বিপ্লব নহে।

জনসাধারণ তখন বারংবার নূতন শাসকসম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তোমরা বল, আমরা এখন কি করিব, কেমনভাবে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিব, নূতন সমাজ কি ভাবে রচনা করিব। কিন্তু এই আসল বিপ্লবের সম্বন্ধে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কোনই জ্ঞান ছিল না। পুরাতন জীবনধারার পরিবর্তে নূতন এক জীবনধারা রচনা করিতে হইবে, ইহা তাহাদের জানা ছিল না। রাজশক্তির হস্তান্তরকেই তাহারা বিপ্লব বলিয়া ভুল করিয়াছিল। কিন্তু বিপ্লব আসিবে মানুষের প্রতিদিবসের জীবনযাত্রার মধ্যে, তাহার খাওয়ায়, পরায়, কর্মে, পরস্পরের মধ্যে সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের সম্পর্কে। প্রতি ক্ষেত্রে পুরাতনের পরিবর্তে নূতন সুচিন্তিত ব্যবস্থার উদয় হইবে। রাজশক্তির হস্তান্তর প্রয়োজন, কিন্তু নূতন সমাজের রূপ যদি বিপ্লবীর অন্তরে স্পষ্ট না থাকে, তবে রাজশক্তির অধিকারও অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, পুরাতন শোষণযন্ত্র নষ্ট হইয়া তাহার স্থলে নূতন শোষণযন্ত্রের আবির্ভাব হইবে।

এই জন্য গান্ধীজী বারংবার গঠনকর্মের ভিতর দিয়া প্রজাসাধারণের মধ্যে নূতন জীবনগঠনের প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন। শুধু মৌখিক প্রচার নয়, অন্যবিধ শোষণশূন্য, সাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত সমাজরচনার চেষ্টার ভিতর দিয়া মানুষকে নবজীবনে দীক্ষিত করিতে চান। এই বুদ্ধি লইয়া যদি আমরা গঠনকর্ম অনুসরণ করি তবেই আমাদের অহিংস অসহযোগ সময়কালে সার্থক হইবে। আমাদের চেষ্টা পর্যাপ্ত হইলে হয়তো আইন-অমান্যের প্রয়োজন পর্যন্ত হইবে না। ভিজা কাঠ শুখাইয়া

উনানে ভাল অগ্নিশিখার সৃষ্টি হইবে, এবং সেই উত্তাপের প্রভাবে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র পৃথিবীর বঞ্চিত এবং নিষ্পেষিত নরনারী স্বীয় শক্তিকে আশ্রয় করিয়া মঙ্গলময় মুক্ত সমাজব্যবস্থা গঠনের এবং তাহা রক্ষা করিবার আশ্বাস লাভ করিবে।

গান্ধীজী কি চান

প্রায় বারো বৎসর পূর্বে গান্ধীজীর লেখা হইতে আমি একখানি ক্ষুদ্র সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করি। সেই বইখানির নূতন সংস্করণ যাহাতে গান্ধীজীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নবজীবন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া কয়েক মাস পূর্বে সেবাগ্রামে জনৈক বন্ধুকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাই যে, গান্ধীজী বাংলা দেশে আসিলে আমি যেন নিশ্চয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই জন্য সোদপুরে অবস্থানকালে সংবাদ দেওয়ার পর একদিন গান্ধীজী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সেদিন তারিখ ৪ঠা নভেম্বর ১৯৪৫ সাল। বেলা ৪টা ১৫ মিনিটের সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। সোদপুরে খাদি-প্রতিষ্ঠানের আশ্রমে একটি খোলা বারান্দায় গান্ধীজীর খাট পাতা ছিল। সারাদিন সেইখানে বসিয়াই তিনি কাজকর্ম

করিতেন, কখনও বা পাশের ঘরের মধ্যে বসিয়া দেখাশুনা বা কথাবার্তার কাজ করিতেন। সেদিন যেখানে খাট পাতা ছিল, তাহার কাছেই উপরে পরিপাটিভাবে একটি মশারি টাঙানো ছিল। মশারির বৈশিষ্ট্য ছিল, ইহার চারটি খুঁট নয়, মাত্র দুইটি খুঁট, দোচালা ঘরের চালের মত খাটের উপরে খাটানো হইত। গান্ধীজী পরিষ্কার ধব্‌ধবে বিছানার উপরে বসিয়া ছিলেন, নিকটে একটি ছোট টুলের উপরে দুই-একটি ধাতুপাত্র ছিল, এদিকে ওদিকে কয়েকখানি বেতের মোড়া ছিল।

নিকটে যাইবার পর গান্ধীজী আমাকে একটি মোড়ায় বসিতে বলিলেন এবং নিজেই কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। সেই কথাবার্তার মধ্যে সামান্য অংশ বাদ দিয়া নীচে প্রকাশ করিতেছি। বাদ দিবার কারণ, কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছিল। তদ্ভিন্ন আলোচনার বাহিরে দুই-একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লইয়াও কথা হইয়াছিল। সেগুলি মনে আছে, কিন্তু লিপিবদ্ধ করি নাই, প্রয়োজন ছিল না।

গান্ধীজী আরম্ভ করিলেন, তুমি শুধু যে আমার লেখা হইতে সংকলন কর তাহা নয়, ব্যাখ্যাও করিবার চেষ্টা কর। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমি যাহা লিখি, কাজে পরিণত করিবার সময়ে তাহা হইতে ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব আমি চাই যে, যখন আমি কাজে ব্যাপৃত থাকি, অথবা দেশের মধ্যে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করি, তখন তোমার পক্ষে সঙ্গে থাকিয়া সকল বিষয় দেখা দরকার। বহুদিন পূর্বে আমি মেদিনীপুরে নাড়াজোলের মহারাজার বাড়িতে গিয়াছিলাম।

সেখানে সোনার পাত্রে আমাকে খাইতে দেওয়া হয়। যদিও সোনার থালে খাওয়া আমার পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ, তবু আমি তখন খাইতে অস্বীকার করি নাই। সেইরূপে আর একবার রেলে ভ্রমণকালে আমি আঙুর খাইতেছিলাম। জনৈক সহযাত্রী তাহা দেখিয়া আমাকে তিরস্কার করেন যে এত দামী ফল আমার পক্ষে খাওয়া উচিত নয়।

আমি। তিনি হয়তো কোথাও শুনিয়া থাকিবেন, আপনি দৈনিক ছয় পয়সার মত আহার করেন।

গান্ধীজী। তুমি ঠিকই বলিয়াছ, তাঁহার সেইরূপ ধারণাই ছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, ভালই হইয়াছে। আপনি আমাকে আঙুর খাইতে দেখিলেন। আপনার উচিত, ইহা প্রকাশ করা যে গান্ধী যদিও দরিদ্রের সঙ্গে এক হওয়ার আদর্শ প্রচার করে, কিন্তু কার্যত সে এখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ভদ্রলোক অকারণে লজ্জিত হইয়া উঠিলেন।

আমি। বাপুজী, এ বিষয়ে আমরা আপনাকে ভুল বুঝিব কেন?

গান্ধীজী। কিন্তু আদর্শ এবং সাধনার মধ্যে যে ব্যবধান কার্যত আসিয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে তোমার জানা দরকার। আমি যাহা লিখি, তাহা হইতে আমার সমগ্র রূপ ফুটিয়া উঠে না। কারণ লেখায় আদর্শ সম্বন্ধে আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠে, আমি বাস্তবে যেখানে পৌঁছিয়াছি তাহার প্রতিচ্ছবি তো থাকে না। অতএব শুধু লেখার বিচার করিলে তুমি আমার সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করিতে পারিবে না। আমার

দৈনন্দিন আচরণ, এবং আদর্শকে রূপ দিবার জন্য যে-সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছি সেগুলির সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ-পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'গান্ধী, তুমি ভাল, কিন্তু যাহারা তোমার সঙ্গে কাজ করে তাহারা ভাল নয়'। আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম, যাহাদের লইয়া আমার কাজ, যাহাদের সহযোগিতায় অহিংসার আদর্শকে রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহারা যদি অক্ষম হয় তবে সে অক্ষমতা আমার নিজের, স্বতন্ত্রভাবে আমি ভাল হই কেমন করিয়া ? ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু ঘটিলে, তাহার মূল নিশ্চয় আমারই মধ্যে নিহিত আছে, আদর্শটিকে কার্য্যকরীভাবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব আমিই লইয়াছি।

আমি। বাপুজী, এজন্যও আমার পক্ষে আপনার কাজ পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা ভারতবর্ষে যে সকল আন্দোলন বহিয়া গিয়াছে, আপনার আদর্শ কার্যত যে রূপ লইতেছে, তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ-সংযোগ তো রহিয়াছে।

গান্ধীজী। সে কথা ঠিক হইতে পারে। রোম্যা রোলাঁর সহিত আমার আলাপ হইবার পূর্বেই তিনি আমার একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মত প্রতিভাশালী লেখকের কথা স্বতন্ত্র।

আমি। কিন্তু বাপুজী, রোলাঁ আপনার প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অহিংস অসহযোগের বীর্যের দিকটি তাঁহার দৃষ্টিতে ঠিকই ধরা পড়িয়াছিল

বটে, কিন্তু ভারতের সমগ্র আন্দোলনকে তিনি নেতিধর্মী মনে করিয়াছিলেন, ইউরোপের সংস্কৃতি বা সাধনাকে অস্বীকার করাই যেন তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতের অহিংস আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে এরূপ মত পোষণ করা ঠিক হয় নাই।

গঠনকর্মের ভিতর দিয়া যে নূতন জীবন আপনি গড়িয়া তুলিতে চা'ন, তাহার প্রভাবে বিরুদ্ধ শক্তি ক্ষীণ হইয়া অবশেষে নিঃশেষ হইয়া যায়, অবহেলা এবং উপেক্ষার আঘাতে, সাক্ষাৎ-আক্রমণের ফলে নয়। এবং আপনার ভাঙা, নূতন জীবন গড়ার ভিতর দিয়াই সাধিত হয়। এদিকটির প্রতি রোলাঁ সুবিবেচনা করেন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র। সমগ্র দেশময় আপনার আদর্শের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করিতে পারি—নিজের জীবনের মধ্যে এবং সমাজের জীবনের মধ্যে। সেইজন্য আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলের প্রয়োজন হয় না। অবশ্য আপনার গড়া প্রতিষ্ঠানের কথা স্বতন্ত্র। সেগুলির সম্বন্ধে আমার একটি স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা আছে।

গান্ধীজী। রোলাঁর সম্পর্কে তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা অংশতঃ সত্য, এবং সেইজন্য আমি সাক্ষাতের পর তাঁহাকে ভারতবর্ষে আসিয়া সকল অবস্থা নিজে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁহার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সৌভাগ্য আমাদের আর ঘটিয়া উঠিল না।

কিন্তু আমি যে বিষয়ে বলিতেছিলাম। কেহ কেহ মনে করেন, অহিংসার আদর্শকে পালন করা সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত এবং যাঁহারা আপাতত অহিংস-সাধনার চেষ্টা করিতেছেন,

তাঁহারাও আমার ব্যক্তিগত প্রভাবের যাদুমন্ত্রের দ্বারাই চালিত হইতেছেন। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া আমি মনে করি না। অহিংস আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার বশে তাঁহারা চলিয়াছেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সেই চলার মধ্যে পদে পদে ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। আমি চাই, অহিংসার আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় আমাদের গতির সম্বন্ধে সংস্কারশূন্য মন লইয়া লোকে দৃষ্টিপাত করুক, বৈজ্ঞানিকের সুদক্ষ দৃষ্টি লইয়া পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে বিচার করুক এবং অহিংসাকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার দ্বারা উত্তরোত্তর কতদূর পর্যন্ত রূপ দেওয়া যায় তাহার যথাযথ বিচার করুক। পরীক্ষার মধ্যে যদি পূর্বাহ্নে আমাদের ধারণা থাকে যে, অহিংস-সাধনা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে সেরূপ লোকের দ্বারা বিচার কখনও সঠিক হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকের মুক্ত সত্যদৃষ্টি সাধনের প্রয়োজন আছে, এবং এইরূপ দৃষ্টি লইয়াই তুমি প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরীক্ষা কর ও তোমার মনে ঠিক যাহা আসে, তাহা আমাকে জানাও।

আমি। বাপুজী, এরূপ গুরু দায়িত্বের যোগ্য আমি নই।

গান্ধীজী। ব্যক্তিগতভাবে তোমার কথা নয়। আমি সত্যসন্ধানী সকল মানুষের কাছে অহিংস আদর্শ ও সাধনার সম্বন্ধে সম্যক্ বিচার চাই। শ্রদ্ধার সহিত, সহানুভূতির সহিত, মানুষ ভারতবর্ষে অহিংসপ্রচেষ্টার সম্পর্কে অনুসন্ধান, বিচার এবং চিন্তা করুক, ইহাই আমার প্রার্থনা।

আশ্চর্য মানুষ! সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহার প্রভাবের দ্বারা আজ প্রভাবান্বিত হইয়া আছে, ভারতে জনসাধারণের উদ্বুদ্ধ আত্মা যাঁহার ভাষায় ভাষা পায়, যাঁহার নির্দেশিত কর্মধারার মধ্য দিয়া যাহাদের মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করে, যিনি বিপথগামী জনশক্তিকে স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি ধরেন, নিজের সম্পর্কে তাঁহার কি আশ্চর্য অভিমানশূন্যতা, কি অসাধারণ কঠোর সত্যনিষ্ঠা! গান্ধীজী যে বলেন, 'পূর্বে আমি বলিতাম, ঈশ্বর সত্যের মূর্তিতে প্রকাশিত হন, কিন্তু আজ বলি—সত্য-ই ব্রহ্মস্বরূপ', এ কথা উপনিষদের বাণীর মতই সংস্কারশূন্য অনুভবসিদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো এমনই অপর একজন সত্যসন্ধানী সাধক বহুযুগ পূর্বে বলিয়াছিলেন—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

সত্যের স্বরূপ হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। যেহেতু সত্যধর্মের উপলব্ধি আমার ধর্ম, তুমি আমার জন্য, হে পূষন্, দৃষ্টিপথ হইতে সেই আচ্ছাদনকে অপসারিত কর, যেন আমি সত্যকে দেখিতে পাই।

বাঁধাধরা কোন সূত্র আমার নাই, জীবনে যাহা ধরিয়া চলিতে হইবে। সত্যাগ্রহ-বিজ্ঞানের সমগ্র রূপ আমি প্রকাশ করিয়া ধরিতে পারি নাই। আমি এখনও পথের সন্ধানে অন্ধকারে হাতড়াইতেছি। আমার এই পথ খোঁজা আপনার যদি মনে লাগে, আপনি যদি আহ্বান শুনিতে পান তবে আমার সাথী হউন।

* * * *

যে কর্মধারা লইয়া আমি দাঁড়াইয়াছি আমার বন্ধুগণ যদি নিজ জীবনে তাহার প্রবর্তন করেন অথবা আমার পন্থায় বিশ্বাসবান না হইলে যদি তাঁহারা তাহার প্রবলতম প্রতিরোধ করেন, তবেই আমার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

— গান্ধী